নিলামবালা

সন্তোষ ঢালী

নিলামবালা

সন্তোষ ঢালী

ঐতিহ্য

সন্তোষ ঢালী
মা: শ্রীমতীদেবী ঢালী
বাবা: নিত্যানন্দ ঢালী
জন্ম: পয়লা বসন্ত ১৩৭০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।
জন্মস্থান: পুকুরিয়া, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।
শিক্ষা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে
বি.এ. (অনার্স), এম.এ, বি.এড, এম.ফিল, পিএইচ.ডি।
সংগীত: বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে
উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ।
শখ: গিটার বাজানো, গান করা, আবৃত্তি করা।
তালিকাভুক্ত শিল্পী: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ও
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
তালিকাভুক্ত গীতিকার: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
পেশা: অধ্যাপনা। বি.সি.এস. (শিক্ষা)।
কর্মস্থল: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ;
সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।
পুরস্কার: একুশের সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা ১৯৯০,
সুনীল সাহিত্য পুরস্কার, মাদারীপুর ২০০৯,
অনুভব সম্মাননা, ঢাকা ২০১৩,
বিন্দু বিসর্গ সম্মাননা, গাইবান্ধা ২০১৬।
সম্পাদনা: নৈবেদ্য, ফুলকি, কালরাত।
প্রকাশিত বই:
কবিতা: ফসিল, প্রপার জন্য পঙ্‌ক্তিমালা,
একলব্যের তীর, ভুবনডাঙা, আকাল।
গল্প: অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে, নিলামবালা, ছাই, দর্পণ, ৭১।
উপন্যাস: মন না মতি, অচেনা মানুষ।
পাঠ্য: ব্যাবহারিক বাংলা (ব্যাকরণ)।
অভিপ্রায়: ফিরে চল মাটির টানে।

নিলামবালা সম্পর্কে

‘নিলামবালা’ সন্তোষ ঢালীর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মানুষ ও মানুষের মন; স্বদেশ ও সমাজ তাঁর গল্পের বিষয়। সমাজের হত-দরিদ্র সাধারণ মানুষের কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর প্রতিটা গল্পে। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জীবন-খণ্ড তাঁর গল্পের উপাদান। মানুষের নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতার প্রকাশ ঘটেছে এ সব গল্পে। তা পড়ে বিস্মিত হতে হয়। কখনও ক্ষত-বিক্ষত হয় হৃদয়, আবার কখনও জন্ম নেয় তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের। গল্পগুলো যেন সমাজের নানা অসঙ্গতির নীরব প্রতিবাদ। বেকার এক দরিদ্র যুবকের আশা-বঞ্চনা-হতাশার প্রতিচ্ছবি **‘নিলামবালা’** গল্প। গল্পের শেষে যুবক এক পতিতার মধ্যে বাংলাদেশের আত্মার আর্তনাদ শুনতে পায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিকতার পরিচয় পাওয়া যায় **‘খাটাশ’** ও **‘প্রহর’** গল্পে। যুবতী বোনের লাশ মাত্র ষোল শ’ টাকায় হাসপাতালে বিক্রি করে আসা বিপর্যস্ত ভাইয়ের মর্মান্তিক পরিণতি দেখি **‘টানাপোড়েন’** গল্পে। ঠগ, প্রতারকের বারবার প্রতারণার শিকার এক গ্রাম্য মেয়ের করুণ কাহিনি **‘সুমতি’** গল্প। **‘নিলামবালা’**র প্রতিটা গল্পেই জীবনঘনিষ্টতার ছাপ রয়েছে। গল্পগুলোতে গভীর ব্যঞ্জনা ও মহামুহূর্ত সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটা গল্পেই রয়েছে নাটকীয়তা। চরিত্র নির্মাণে গল্পকার ছিলেন অনুশীলনরত। আমার বিশ্বাস, নিরীক্ষাধর্মী এ গল্পগুলো পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে।

– প্রকাশক

প্রকাশক
মো. আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

স্বত্ব
সুমনা বিশ্বাস

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
বিবি মার্কেটিং

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য: একশত টাকা

NILAMBALA A collection of short stories by Santosh Dhali. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem. Oitijhya. Date of publication February 2007.

Website: www.oitijhya.com

Price Taka: 100.00 US 3.00

ISBN 984-776-511-1

সূচি

খাটাশ	০৮
ভাতার মারা পাথার	১৭
চারকাটা জমি	২৪
টানাপোড়েন	৩০
নিলামবালা	৩৬
পরভৃত	৪৫
প্রহর	৪৯
আর্তনাদ	৫২
দুধবাবা	৫৭
সুমতি	৬৪

পারুলপ্রভা বিশ্বাস
ভীষ্মদেব বিশ্বাস

যাঁদের স্নেহ আমাকে ছায়া দেয়

খাটাশ

এক

ধড়মড় করে উঠে বসে খাদিজা। বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে থাকে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে তার কেমন ভয় ভয় করে। গলা শুকিয়ে কাঠ। চারদিকে কালোজামের মতো অন্ধকার। হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক ভয়ার্ত ডাক আর পাখা ঝাপটানো তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। সর্বনাশ! ঘরে খাটাশ ঢুকিছে। বারান্দায় হাঁসের বাক্স। তাতেই খাটাশের লোভ। পাটখড়ির বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়েছে ঘরে। এখন উপায়? বাতি খুঁজে পেলেও ম্যাচ খুঁজে পেতে একটু দেরি হলো খাদিজার। কাজের সময় হাতের কাছে কাজের জিনিস পাওয়া যায় না।

আলো নিয়ে বারান্দায় যেতেই দিশেহারা খাটাশ এক ছুটে পালাতে গিয়ে এক লাফে আচমকা পড়ল এসে খাদিজার বুকে। ঘটনার আকস্মিকতায় খাদিজা হকচকিয়ে যায়, বাতি নিভে যায় এবং মুখ দিয়ে ভয়ার্ত ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে আসে– 'আল্লাহ্'। এবং এ অবকাশে খাটাশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় আরও দ্বিগুণ বেড়া ভেঙে। খাদিজার বুকে দুরন্ড় ঢেঁকির পাড়। হাঁসগুলো ভয়ে নিশ্চুপ। জামাল বাড়ি ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একা খাদিজা কেমন অসহায় বোধ করে। মৃগী রুগীর মতো কাঁপতে থাকে ভয়ে।

খাটাশ পালাতে না পালাতেই ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ধারাল চকচকে তলোয়ারের মতো তিন ব্যাটারি টর্চের এক তির্যক আলো এসে পড়ে হাঁসের বাক্সের ওপর। খাদিজার চিৎকারই যেন প্রতিফলিত হয়ে ব্যুমেরাঙের মতো টর্চের আলো হয়ে ফিরে আসে খাদিজার পায়ের কাছে। টর্চের আলোটা স্থান পরিবর্তন করে পা বেয়ে ওপরের দিকে ওঠে এবং উঠতে উঠতে মুখে এসে থামে। দু'এক সেকেন্ড; তারপরই আলোর তীরটা পিছলে পড়ে খাদিজার বুকে এসে বিদ্ধ হয় এবং কিছুক্ষণ স্থির থাকে, যেন জিওলের আঠায় লেগে থাকা এক টুক্‌রো স্বচ্ছ সাদা কাগজ। ঘুম ভেঙে উঠে আসা রাত দশটার খাদিজা ছিল এলোমেলো শাড়িতে জড়ানো জীবন্ত এক ক্যানভাসের ছবি। দ্রুত তাই বুকের আঁচল টেনে দেয় কেমন এক ভীত-বিহ্বল আরক্তিম আড়ষ্টতায়। মুখ পাংশু হয়ে যায়। এবং ঠোঁট দু'টো শক্ত মমি। তাই কোনো কথা বেরোয় না। হঠাৎ ঠাটা পড়ার মতো বাজখাই এক গলা খাঁকারি এবং পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে আসা আওয়াজের মতো কণ্ঠস্বরে কথা শোনা যায়– 'আমি ইমাম সাহেব, রজব আলি। কী হইয়েছে খাদিজা?'

খাদিজা কিছুক্ষণ বাক্‌রহিত, তারপর ঢোঁক গেলে এবং পরে বলে– 'খাটাশ। ঘরে খাটাশ ঢুকিছে।' চমকে ওঠে ইমাম সাহেব। কথাটা তার কানে গরম তেলের ফোঁড়ন ঢালে। আঁৎকে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো– 'কথাডা তারে কয় নাই তো খাদিজা?' পর মুহূর্তেই স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে বলল– 'তাই কও। কোনানে খাটাশ?' তখনও খাদিজার বুকে অসম্ভব ঢেঁকির পাড়– ঢিব্ ঢিব্ । মুখে কোনো কথা না বলে আঙুল তুলে দেখাল– সামনে। সামনে তখন খাটাশ অনুপস্থিত। তবে অস্তিত্বের চিহ্ন বর্তমান।

টর্চের বৈদ্যুতিক আলোটা এতক্ষণে খাদিজাকে ছেড়ে বাক্সের ভাঙা দরোজাটার ওপর এসে পড়ল। হাঁসগুলো ভেতরে জাড়োসড়ো। বাইরে অসাধারণ চিত্রকলার সৃষ্টি। দুধের মতো সাদা হাঁসটা রক্তে মাখামাখি পড়ে আছে নিথর। গোটা দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে পালিয়ে গেছে খাটাশ। খাদিজা তাকিয়ে রইল তার প্রিয় হাঁসটার রক্তাক্ত দেহটার দিকে। আর ইমাম খাদিজার দিকে। খাদিজার হত-বিহ্বলতার সুযোগে তার একটা হাত চেপে ধরল ইমাম সাহেব। এবং কিছুটা ঘনিষ্ঠ হতে গেলে খাদিজার ডান হাতটা হঠাৎ সচল হয়ে ওঠে এবং ইমামের হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে। কিন্তু আলোটা নেভে না। টর্চের আলোটা গুলীবিদ্ধ সৈনিকের মতো কাৎ হয়ে শুয়ে থাকে মাটিতে। ইমামের গালভর্তি মখমলের মতো দাড়ি থাকায়, ঠাস্ করে কোনো শব্দ হয় নি; কিন্তু ব্যথা লেগেছিল ঠিকই এবং আঁতে ঘা লেগেছিল তারচে বেশি; অপমানিত বোধ করেছিল খুব। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি না থাকলেও ইমাম এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল– কেউ তাকে দেখে ফেলল কি না। এর আগে

কখনও কোনো মহিলার হাতের থাপ্পর খায় নি ইমাম, তাই কেমন একটা ঘৃণা-রাগ-লজ্জা মেশানো অনুভূতি হলো তার। চাপা অথচ রাগত স্বরে বলে উঠল– 'কাজটা ভালো কইরল্যা না খাদিজা।'

বারান্দার ঘরে তখন অন্ধকার, সাদা হাঁসের রক্তাক্ত লাশ, শুয়ে থাকা টর্চ-লাইট এবং মুখোমুখি পাংশুল খাদিজা ও হিংস্র ইমাম। ইমাম হঠাৎ ক্রুদ্ধ আক্রোশে শক্ত পেশীতে খপ্ করে জাপটে ধরে খাদিজাকে– যেন একটা সাদা হাঁসকে ধূসর খাটাশ। ফুঁসতে থাকে ইমাম– 'এ্যাত্তো ত্যাজ? ত্যাজ ভাইঙ্গ্যা দেবো'। যাঁতাকলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো গোঙাতে থাকে খাদিজা। ছটফট করে। ইমাম যেন পদ্মপুকুরে উন্মত্ত এক মোষ। অন্ধকারে সাদা হাঁস আর রক্ত দৃশ্যমান নয়। তবু গন্ধ জেগে থাকে। একটা সাদা হাঁসের মৃত্যু হয়। মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়া হাঁসগুলো আতঙ্কে ছটফট করে ওঠে এবং বার কয়েক ডেকে চুপ হয়ে যায়।

দুই

সে রাত চলে গেলেও ইমামের জীবন থেকে, তার মন থেকে রাগ গেল না। মেয়েছেলের হাতের চড় যেন জোঁকের মতো লেগে রয়েছে তার গালে। শুষে শুষে তার রক্ত খায়। সহজে হজম হবার নয়। ইমামের মনে ফন্দি-ফিকিরের আনাগোনা। প্রতিশোধ সে নেবেই। কঠোর প্রতিশোধ। ভাবতে ভাবতে দেখতে পায় জামালকে। সন্ধের আগে আগে ফিরছিল বাজার থেকে। মসজিদের কাছে আসতেই ডাক দেয় রজব আলি– 'শুনিয়্যা যাও জামাল, কতা আছে। বাজারে কিছু শুনিছো মিলিটারিগে ব্যাপারে?'

– শুনিছি। গোপালগঞ্জ শহরে নাকি মিলিটারি আসিছে। আগুন দিয়া নাকি ঘর-বাড়ি পোড়াইয়া দিতিছে। ঘাঘর বাজারেও নাকি শিগ্‌গিরই আসিয়্যা পড়বো। শিগ্‌গিরই নাকি আক্রমণ হতি পারে।'

– কী কও, আক্রমণ! পাকিস্তানি আর্মি; হ্যারাতো ফেরেস্তা। আমাগে উদ্ধার করতি আসিছে। তুমি কতিছো আক্রমণ? যাক গে, সেই কতা কতিইতো তোমারে ডাকিছি।

– মানে?

– আমাগে এলাকায় মিলিটারি আইসবো, হ্যাগো পথ-ঘাট চিনান লাগবি না? হ্যারা আমাগে মেহমান। আদর-আপ্যায়ন করতি হবি না? সেই জন্যিইতো আমরা একটা কমিটি করিছি। সারা দ্যাশে এই কমিটি হতিছে। নাম শুনিছো? কান্তি কমিটি।

– শান্তি কমিটি? মানে? শান্তির কাজ কইরবে?

– তাহলি আর কতিছি কী? দ্যাশে কুনো অশান্তি হতি দিবো নানি। আমরা মালাউনগে একটা লিস্টি তৈয়্যার কইরবো, আর একটা মুক্তিযোদ্ধাগে পরিবারের। আর একটা লিস্টি করতি হবিনে– মালাউনগে সাথে যারা মিলামিশা করে, আর যারা স্বাধীনতা চায়, তাদের।

– তাতে কী হবি নে?

– মিলিটারিগে হাতে লিস্টি ধরাইয়া দেবানি। বাছি বাছি তাগে মারবে, তাগে বাড়িঘর পোড়াবে। নালিতো হক্কলেরেই মাইর‍্যে ফেলবো।

– কী কতা কলা ইমাম? এডা কি মাইনসের মতো কতা কলা?

– মানে? আমরা শান্তি চাই। যারে তারে মারবে ক্যান? শুনিছো, আমরা শান্তি কমিটির একটা শাখা বানাইছি। তুমি আমাগে দলে নাম লেখাও। নালি কলাম বাঁচতি পারবা নানি।

– তোমাগে এ কমিটিতি আমি নাই। গ্যালাম।

– অতো দেমাগ ভালো না কলাম, জামাল। তোমারে চিনি না ভাবিছো? মালাউনগে সাথে বেশি পিরিত তোমার। সেই জন্যিই রাজি হলা না। ফল কিন্তু ভালো হবি নানি জামাল।

জামাল ফেরে না। পেছনে ইমামের গর্জন শোনে–

– রাইতের বেলা মেম্বাররে নিয়া তোমাগে বাড়ি যাবানি কলাম। ভাবিয়া দেইখো।

মাথায় বাজারের ধামা নিয়ে জামাল হন হন করে বাড়ির দিকে ছোটে। বন্ধু সনাতনের সঙ্গে দেখা পথে। তাকে সাথে নিয়ে বাড়ি এলো। এক জোড়া হাঁস বিক্রি করে বাজার করে এনেছে। ইলিশ মাছ কিনেছে একটা। সনাতনকে না খাইয়ে ছাড়বে না সে। খাদিজাকে মাছ ভাজতে বলে দুই বন্ধু বসেছে গল্পে। ইলিশ ভাজার গন্ধ যেন সারা ঘরে ছড়িয়ে দুই বন্ধুকে জড়িয়ে রেখেছে। ছেলেবেলা থেকেই দুই বন্ধুতে গলায় গলায় ভাব। এক হুঁকোয় তামাক খায়, এক গেলাসে জল খায়, এক থালায় ভাত খায়। কখনও জাত-পাতের প্রশ্নও মনে আসে নি। হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্যটা কোথায়– তাও তারা বোঝে না। মাছ ভাজার ঘ্রাণের সাথে খাদিজার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে– হাত ধুয়ে নাও সনাতনদা, খাবার দিতিছি। দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে ওঠে। অজানা আতঙ্ক ছড়ায়। বাঘ ডাকার আগে যেন ফেউ ডাকে।

গরম গরম ভাতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ইলিশের তেল আর গরম গরম মাছ ভাজা। পরম তৃপ্তিতে খেয়ে হুঁকোয় তামাক সেজে বিশ্রাম নিচ্ছে দুই বন্ধু। নানা গল্প করছে। পাশেই বসে খাচ্ছে খাদিজা। বিছানায় ঘুমুচ্ছে তিন মাসের ছেলে রমজান। মাঝে মাঝে চমকে নড়ে উঠছে। আবার ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে কখনও একা একা হেসে উঠছে। খাদিজার বুকটা ভরে ওঠে। তাদের প্রথম সন্তান রমজান। গরিবের ছেলে। তবুও ছেলেকে নিয়ে তাদের কত আশা– লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবে। ছেলে চাকরি করবে। তাদের কোনো অভাব থাকবে না। ভাবনায় তলিয়ে যায় খাদিজা।

জামাল বলছে– শুনিছো সনাতন, চারিদিগে মিলিটারিগে টর্চার চলতিছে। তার মইদ্যে রজব আলি ইমামরা শান্তি কমিটি কইরছে। কার কার বাড়িঘর আগুন জ্বালি পুড়াইবো, তার লিস্টি করতিছে। আমারেও শাশালো। কলো– রাইতে যাবানি তোমাগে বাড়িতি। ঘাঘর বাজারেও নাকি শিগ্‌গিরই আইসবে।

– কতাডা আমিও শুইন্যাছি।

– এখন তালি উপায়?

বর্ষার ভরা নদীর স্রোতের মতো খাদিজার আবেগ-বিহ্বল ভাবনা চলতে থাকে রমজানকে ঘিরে। রমজান মাসে মাসে চাকরির টাকা পাঠাবে। তাদের হাঁসের বাক্সটা আরও বড় এবং মজবুত করবে। যাতে খাটাশ ঢুকতে না পারে, তাই খড়ির বেড়ার বদলে টিনের বেড়া দেবে। অবশ্য তখন এই খড়ের ঘরও থাকবে না। টিনের ঘর হবে। এ রকম কোনো এক রাতে খাদিজা খেতে বসবে, এমন সময় রমজান ছুটিতে বাড়ি আসবে। ফিরতে ফিরতে তার রাত হয়ে যাবে বলে টর্চ জ্বালিয়ে আসবে। বাড়িতে উঠেই রমজান তাকে ডাক দেবে– আম্মাজান–

খাদিজা কেমন একটা ধাক্কা খায়– রমজান এরকম বাজখাঁই গলায় ডাক দেয় ক্যান? কেমন ইমাম হারামজাদার গলার মতো আওয়াজ। আবার ডাকে–

আ . . . জ্ . . . জামাল, বাড়িতি আছো?

সেই টর্চের তির্যক আলো এসে পড়ে খাদিজার শূন্য থালে, থাল থেকে মুখে। সংবিৎ ফিরে পায় খাদিজা– এ যে ইমাম। রমজানতো তিন মাসের, বিছানায় শোয়া। এতক্ষণ সে ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল। বাস্তবে ফিরে আসতে দেরি হয় না তার। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠে শূন্য থালাটা নিয়ে চলে গেল খাদিজা।

রজব আলি ইমাম এলাকার মেম্বর আক্কাস এবং তিন চার-জন লোক সাথে নিয়ে হাজির হলো এসে জামালের বাড়ি। এদের আসাটা জামালের পছন্দ না হলেও এলাকার মেম্বর এসেছে বলেই খাতির করতেই হলো। বসতে বলল। সনাতনের দিকে ভ্রুকুটি হেনে তারা বসল। সনাতন এখানে আর থাকাটা সমীচীন মনে করল না। বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। ইমাম কটাক্ষ করে বলল–

– ও ব্যাটা মালাউনেরপো তোমাগে বাড়িতি ঘুর ঘুর করে ক্যান? এ্যাতো কেষ্ট পিরিত কীসির?

মেম্বর– হিন্দুগে সাথে কি মুসলমানের বন্ধুত্ব হয়? শুনিছো কুনোদিন? ত্যালে আর জলে কি কুনোদিন মিশ খায়?

ইমাম– এইডা হলো গিয়া পাকিস্তান। মালাউনগে জায়গা নাই।

জামাল– কী কতি চাও তোমরা?

ইমাম– কতাডা জলের নাহাল সোজা। মালাউনগে সাথে পিতলা পিরিত ছাইড়্যা আমাগে দলে যোগ দ্যাও। নালি কলাম বিপদ আছে। আমরা পাকিস্তানের শত্রুগে লিস্টি করতিছি। কাউরি রেহাই দেবে নানি কলাম।

মেম্বর– আমাগে দলে আলি তোমার কুনো ক্ষেতি হবি নানি, বরং লাভ হবি নে। হিন্দুগে ট্যাহা-পয়সা, সোনা-দানা বেবাক আমরা কাড়িয়্যা নেবো। আমাগে সাথে থাকলি, তুমিও তার ভাগ পাবা নে।

জামাল– তোমরা এ্যাত্তো খারাপ? আমি ওসব পারবো নি। আমি তোমাগে দলে নাই। তোমরা এ্যাহোন যাতি পারো।

ইমাম– তাড়াইয়্যা দিতিছো? এইডার ফল কলাম ভালো হবি নানি জামাল। সাবধান কইর‍্যা দিতিছি– মালাউনগে সাথে বেশি খাতির দিও না।

জামাল– সেইড্যা আমার ব্যাপার। আমি কী কইরবো, কী না কইরবো, তা তোমাগে কাছে জিগাতি যাবো নানি।

আড়ালে দাঁড়িয়ে এইসব শুনছিল খাদিজা। ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। এ কীসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল ইমাম? তার দু'চোখের উদ্বেগ আর আশঙ্কার আতঙ্ক নিয়ে কাঁপছিল পিদিমের শিখা। চোখের সামনে সে যেন সর্বনাশের আগুন দেখতে পায়। চিন্তিত জামালও। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে দু'জনে বিছানায়। কোনো কথা বলে না কেউ। যার যার মতো করে ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকে। ভাবনা যেন জোঁকের মতো লেপ্টে থাকে দু'চোখে। খাটাশ ঠেকাতে বেড়ার ফাঁকে ছেঁড়া জাল পেতেছে খাদিজা। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। ঘুম আসে না। ঘুম আসে না জামালেরও। শুয়ে শুয়ে শঙ্কা, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার জাল বোনে দু'জনে।

তিন

চৈত্র মাসে ফাটা শিমূল তুলোর ওড়াউড়ির মতো বাতাসে মিলিটারি আসার গুজব ভেসে বেড়ালেও কারও মনে তখনও কোনো ভয় জাগে নি। আতঙ্কের ভূতটা সেদিনই প্রথম ঢুকে পড়ল মানুষের মনের মধ্যে। সনাতনের বাড়িতে ছিল সেদিন তেন্নাতের (ত্রিনাথের) মেলা। প্রায় শ'খানেক লোক উপস্থিত। সনাতনের বাড়ির যে কোনো অনুষ্ঠানে জামালের থাকা চাইই। আজও ছিল। ঈদ কিংবা পূজা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ অঞ্চলের সকল মানুষের উৎসব। জাত-পাত কিংবা ছোঁয়াছোঁয়ির কোনো বালাই নেই। সবার সমান অংশগ্রহণ। ঢোল বাজাচ্ছে বুড়ো রহিম চাচা। আর তার ছোট ছেলে বেলাল বাজাচ্ছে করতাল। তেন্নাতের গান অবশ্য গাইছে নীলকান্ত মজুমদার। এতক্ষণ তেন্নাতের কাহিনি বর্ণনা করছিল রমেন মল্লিক।

এবারে গাঁজা টানার পালা। ছেলে বুড়ো সবাই গাঁজার কল্কিতে টান মারে এ সময়। কেউ কাউকে নিষেধ করে না। কেউ কিছু মনেও করে না। এটা হলো শিবের প্রসাদ। প্রতীকী বটগাছ হিসেবে বড় একটা বটের ডাল পোঁতা হয়েছে উঠোনের ঠিক মাঝখানে। বটতলা মেলা। বটগাছের চারদিকে সবাই গোল হয়ে বসেছে বটগাছটা ঘিরে। তিনটে কল্কিতে একজনে গাঁজা সাজিয়ে, গাঁজার গুলীতে আগুন দিয়ে ফৎ ফৎ করে কয়েকটা টান মারে। আগুনটা জ্বলে উঠলে বাঁদিকের মানুষদের কাছে দেয়। সে টান দিয়ে তার বাঁদিকের লোকটার হাতে দেয়। এভাবে পরপর তিনটে কল্কে ডান থেকে বামে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। কল্কে বামপন্থী। সব সময় ডান

থেকে বামে ঘোরার নিয়ম। কখনও উল্টোদিকে ঘুরতে পারবে না। কেউ যদি গাঁজায় দম দিতে না চায় বা নেশা হয়েছে বলে আর না টানতে চায়, তাহলে কল্কেটা দু'হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বাঁ পাশের লোকটার হাতে দেয়। এভাবে গাঁজা নিঃশেষ হবার আগ পর্যন্ত সারা আসরে তিনটে কল্কে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। গাঁজার দমের সময় কথা বলার বা কোনো শব্দ করার নিয়ম নেই। সবাই ব্যোম্ মেরে বসে থাকে। আর গাঁজা পোড়ার চড়্ চড়্ শব্দ বা গাঁজা টানার ফৎ ফৎ শব্দ শোনা যায়। কখনও সখনও অবশ্য গাঁজায় দম দেবার কারণে দু'একজনের পশ্চাদ্দেশ দিয়ে হঠাৎ বায়ু নির্গত হয়ে যায় এবং পুম্ করে একটু শব্দ হয়। ছেলে ছোকরারা আবশ্য এতে ভারি মজা পায়। হেসে ওঠে। এ ছাড়া নৈঃশব্দ। কেউ কেউ অবশ্য বমিটমিও করে ফেলে। অনেক সময় দু'একজন মাতাল হয়ে মাতলামি শুরু করে। সেদিন হরিচানদের বাড়িতে গণ খুড়ো হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে দালানের সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে বলে– 'দে, আমার মাথায় উঠায়ে দে। দালানটারে মাতায় কইর‍্যা নাচি।' মাঝে সাজে এ রকম দু'একটা ঘটনা ছাড়া সাধারণত গাঁজার দমের সময় নিঃশব্দ থাকে।

গভীর রাতে সনাতনের বাড়িতে যখন গাঁজার দম চলছিল, আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তখন বিকট এক শব্দ এল গোপালগঞ্জের দিক থেকে। রাতের নৈঃশব্দ এবং গাঁজার দমের নীরবতায় শব্দটা যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে আছড়ে পড়ল আসরে। এবং আরও চতুর্গুণ নীরবতা হয়ে নেমে এলো সেখানে। ঘটনা আন্দাজ করতে কোনো অসুবিধে হলো না কারো। সম্ভাব্য সর্বনাশের আতঙ্কে চুপসে গেল সবার মুখ। দই-খই আর খেজুরে গুড়ের তেন্নাতের মেলার সুস্বাদু প্রসাদ আজ আর কারো মুখে ভালো লাগল না। বিস্বাদ হয়ে গেল মুহূর্তে। কোনোমতে প্রসাদ খেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেলা ভঙ্গ দিয়ে যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সবার শেষে গেল জামাল। সনাতনের মুখটা শুকনা। জামাল চিন্তান্বিত। যাবার সময় বলে গেল– 'সাবধানে থাকিও বন্ধু। সময়টা কলাম ভালো না।' ভাঙা মেলার মাঠে বসে থাকে সনাতন আর সনাতনের বউ। বুড়ো বটগাছ তাদের কোনো ভরসা দিতে পারে না।

চার

দু'দিন পেরুতে না পেরুতেই এক হাটবার ঘাঘর বাজারে এসে থামল ছোট্ট একটা লঞ্চ। শক্ত লম্বা একটা তক্তা লঞ্চ থেকে বেরিয়ে বাজারের মাটি ছুঁলো। তার ওপর দিয়ে সদর্পে লঞ্চ থেকে আগে আগে নামল মসজিদের ইমাম। পরনে বিশাল আলখেল্লা। মাথায় টুপি। পায়ে বুট। চোখ দু'টো হিংস্র হায়েনার মতো। তার থেকে যেন ক্রুদ্ধ আগুন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। ইমামের দর্পিত বুট মাটি স্পর্শ করল। পেছন পেছন নামল জলপাই রঙের পোশাক পরা কতগুলো মিলিটারি। নেমেই দুড়্দাড়্ তারা ছড়িয়ে পড়ল বাজারে। চায়ের দোকানে ঢুকেই গুলী করে মারল খালেক চেয়ারম্যানকে। পাশেই ছিলেন হাইস্কুলের হেডমাস্টার সতীশবাবু। তাকে খুন করল। সাথে সাথে হুলুস্থুল পড়ে গেল বাজারে। সবাই ছুটে পালাতে লাগল। মিলিটারিরা ব্রাশ ফায়ার করতে লাগল দিগ্বিদিক। এ সুযোগে স্টোভের কেরোসিন ঢেলে চায়ের দোকানে আগুন ধরিয়ে দিল ইমাম। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল নিবারণের চায়ের দোকান। ছেঁড়া পাউরুটি কিংবা ভাঙা বিস্কুটের লোভে চায়ের দোকানের সামনে শুয়ে থাকত যে কুকুরটা, ভয়ে খেঁউ খেঁউ করতে করতে ছুটে পালাল। আদিম উল্লাসে মেতে উঠল ইমাম। ইমামের মেহেন্দি লাগানো দাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের রঙ। আগুনের লাল আভায় ইমামের মুখটা ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখায়। জ্বলন্ত চায়ের দোকানের সামনে ইমামকে মনে হয় আগুন-মানুষ। যেন জ্বলন্ত আজরাইল।

গুলীর শব্দ, আগুন, ধোঁয়া, পোড়া গন্ধ, দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি– সব মিলিয়ে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। চিৎকার, চেঁচামেচিতে আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত। ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষের পীড়নে নদীজল তোলপাড়। হিংস্র জানোয়ারের মতো মিলিটারিরা তাড়া করছে সবাইকে। ছুটছে মানুষ। নারী-পুরুষ। কুকুর-বেড়াল। গরু-ভেড়া। প্রাণভয়ে।

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ দিচ্ছে বিশাল ডুব। কেউ জাগছে, কেউ জাগছে না। মুহূর্তে লাল হয়ে গেল সলধা নদীর জল। হোলির দিন নয়, তবু মনে হবে– আজ পৃথিবী মেতেছিল অদ্ভুত হোলি খেলায়।

ইমামের সে কী পৈশাচিক উল্লাস। যেন সে গোটা পৃথিবীর অধীশ্বর, তার হুকুমে চলবে জগৎ-সংসার। যে যার প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে দোকানদাররা। পড়ে রয়েছে দোকান, মালপত্র; খোলা রয়েছে ক্যাশবাক্স। ইমামের পকেট উপচে পড়ছে সে টাকায়। হ্যারিকেন ঝড়ের মতো সব তছনছ করে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিদায় নিল মিলিটারিরা। থেকে গেল ইমাম। পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরল।

দাউ দাউ জ্বলছে ঘাঘর বাজার। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে লাশ। কেউ রক্তাক্ত, কেউ পোড়া বেগুনের মতো অর্ধপোড়া। কেউ গুলীবিদ্ধ অর্ধমৃত কাতরাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। কেউ করছে আহাজারি স্বজন কিংবা সম্বল হারিয়ে। হাটুরে কুকুরগুলোও যেন ভয়ে স্তম্ভিত। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে দাউ দাউ আগুন। পশ্চিমের অস্তপ্রায় সূর্যের রঙের সাথে যেন মিশে গেছে পুবের ঘরপোড়া আগুন, দিগন্ত থেকে দিগন্তে। সূর্য নিভে গেলেও রয়ে গেল আগুনের দগ্‌দগে ঘা।

গ্রাম জুড়ে স্বপ্নভাঙা মানুষের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যেন বইছে বাতাস। উদ্বেগ আর আতঙ্কে ওষ্ঠাগত মানুষের প্রাণ। শুক্‌নো শুক্‌নো করুণ মুখগুলো যেন শ্মশান থেকে উঠে আসা নিস্প্রাণ শবযাত্রী, ছাইভস্ম মাখা। গোটা গ্রামটাই যেন শ্মশান-চত্বর। সনাতন হাটে গেছিল। পায়ে চোট লেগেছে ছুটতে গিয়ে। ভাঙা শিশি বোতলে পা কেটে গেছে অনেকখানি। খবর পেয়ে জামাল গেছে তাকে দেখতে। রাতেই। বাড়িতে একা খাদিজা। কেরোসিনের পিদিম জ্বেলে তিন মাসের শিশুপুত্র রমজানের পাশে বসে অপেক্ষা করছে জামালের জন্য। প্রথমবারের মতো বাজ পাখি ডেকে ওঠে– কড়ু . . . ক.ড়ু.ড়ু.ড়ু . . . . . । রাত প্রথম প্রহর। হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোর ঝিলিকে চমকে ওঠে খাদিজা। পুরনো সেই টর্চের আলো নতুন করে এসে উঠোনে পড়ে। এ আলো তার চেনা। গায়ে নুন পড়া কেঁচোর মতো মুহূর্তে কুঁকড়ে যায় সে। বাজপাখির মতো বাজখাই কণ্ঠস্বর হেঁকে ওঠে– 'জামাল, বাড়িতি আছো নি?' খাদিজার গলা কেঁপে ওঠে–

– 'না। বাড়িতি নাই।'

– কনে গেছে?

– সনাতনদার বাড়িতি। মিলিটারিগি তাড়া খাইয়্যা পায়ে খুব চোট লাগিছে।

– কও কী? বাচিয়্যা আছে, গুলী লাগি নাই?

বলতে বলতে ইমাম ঘরে উঠে খাদিজার পাশে বসে। খাদিজা খাটাশ দেখা হাঁসের মতো চুপ হয়ে যায়। চোখ থেকে চেতনা উড়ে যায়। বারান্দায় একটা সাদা হাঁস, আর ধূসর এক খাটাশ। আর সব ঝাপসা।

– জামালরে বলিও, মালাউনগে সাথে মিলামিশা করলি ফল কলাম ভালো হবি নানি।

খাদিজার মনে হয়– সুদূর কোনো দিগন্তের ওপার থেকে ভেসে আসছে কার অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর। ভয়াল এক তীরের মতো তা তাকে আমূল বিদ্ধ করে।

– বাঁচতে চালি আমার সাথে দ্যাখা কইর‍্যা শান্তি কমিটিতি য্যান নাম লেখায়। নালি বেগতিক হবি নে।

খাদিজা যেন বাস্তবে ফিরে আসে। স্পষ্ট শুনতে পায়– এ ইমামের কণ্ঠস্বর। কঠিনভাবে শাসাচ্ছে। ভয়ে তার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। এ কীসের ইঙ্গিত দেয় ইমাম? একটা ফড়িং উড়ে এসে পড়ে ইমামের পায়ের কাছে। কচি ধানের শীষের মতো গাঢ় সবুজ। সুন্দর। খপ্ করে ফড়িংটাকে ধরে ফেলে ইমাম। দু'আঙুলে চেপে ধ'রে হঠাৎ পিদিমের আগুনে ঢুকিয়ে দেয় ফড়িংটাকে। ফড়িংটা ছটফট করে ওঠে। কেঁপে ওঠে খাদিজা। মনে হলো, তার হৃৎপিণ্ডটাই যেন আগুনে ঢুকিয়ে দিল ইমাম। পোড়া মরিচের মতো এক সময় নিস্তেজ হয়ে যায়। দুর্গন্ধ বেরোয়। খাদিজার ওয়াক আসে। আঁৎকে ওঠে ইমামের কথায়।

– তালি কলাম এরোম্ পুইড়্যে মরতি হবি নে।

পাঁচ

প্রতিদিন মানুষ এখন লঞ্চের শব্দ শোনে সলধা নদীতে। রোজ আতঙ্ক হয়ে এ শব্দ নদী দিয়ে আসে, যায়। কোনো পাড়ে ভিড়ে হয়ত জ্বালায় ঘর-বাড়ি। গুলী করে মানুষ মারে। মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে যায়। আর তারা ফেরে না। তাদের আর্ত চিৎকারে বাতাস কেঁপে ওঠে। টলে ওঠে মাটি, বৃক্ষ। টলে না মিলিটারিদের পাষাণ হৃদয়। তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। স্বজনের সামনে জাপটে ধরে চুমু খায়। বাবা-মার সামনে মেয়েকে উলঙ্গ করে তার গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেয় বন্দুকের নল। মানুষ ধরে ধরে লঞ্চে তুলে হাতের তালু আর পায়ের গোড়ালি ছিদ্র করে, মোটা গুণা দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে দেয় নদীতে। টুপ্ করে ডুবে যায় জীবন্ত মানুষ। এভাবে নিখোঁজ মানুষেরা দু'চারদিন বাদে পচে ভেসে ওঠে জলের ওপরে। কচুরিপানার মতো ভাসতে থাকে পচাগলা বিকৃত লাশ। শুশুক আর মাছদের কাড়াকাড়ি পড়ে যায় লাশ নিয়ে। ঠুক্রে ঠুক্রে খায়। দুর্গন্ধ ছড়ায়। আতঙ্ক ছড়ায়। শোক আর দুর্গন্ধে এলাকার বাতাস ভারি। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে দূরে। কেউ কেউ চলে যাচ্ছে ভারতে। কেউ কেউ ভিটেমাটি কামড়ে পড়ে থাকছে মরে। সনাতনরাও ভারতে চলে যাবে ভাবছে। কিন্তু তার পা এখনও সারে নি। হাঁটতে অসুবিধে। তাই যেতে পারছে না। সকাল হলেই মিলিটারির ভয়ে খোঁড়া পা টেনে টেনে পালাতে যায় বিলের পাটক্ষেতের গভীরে। ফিরে আসে সন্ধ্যায়, আবার একটা সকাল হবার আশঙ্কায়। হঠাৎ মিলিটারি এসে তাড়া করলে খোঁড়া পা নিয়ে ছুটতে অসুবিধে হবে বলে সকালেই পালাতে চলে যায় সনাতন।

ছয়

মরিচের ফলন খুব ভালো এবার। জবা ফুলের মতো লাল লাল মরিচ পেকে আছে খোলা ভরে। দুপুরের রোদ তেঁতে উঠেছে। এখনও লঞ্চের শব্দ শোনা যায় নি। আজ আর মিলিটারি আসবে না মনে হয়। যে দিন আসে, সাধারণত নাশ্তার বেলার মধ্যেই ভট্ ভট্ শব্দে এসে হাজির হয়। মিলিটারিরা দৌড়তেও পারে খুব। লাফ দিয়ে পাড়ে নেমেই শিকারী চিতার মতো দৌড় লাগায়। তারা সাঁতার জানে না। জামালের মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়– একদিন তারা নেমে গেলে, একটা কুড়োল নিয়ে দৌড়ে গিয়ে লঞ্চে উঠে তলিটা ফাটিয়ে দেয়। সাহসে কুলোয় না। আজ আসার সময় চলে গেছে তাদের। একটা দিন পাওয়া গেল। এই ভরসায় দু'টো ধামা নিয়ে বাড়ির পাশের খোলায় পাকা মরিচ তুলতে গেছে জামাল আর খাদিজা। রমজানকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে ঘরে। মরিচ তোলার ফাঁকে ফাঁকে খাদিজা এসে রমজানকে দেখে যায়। ঘুমের মধ্যেই রমজানের মুখে তুলে দেয় মাই, দুধ খাইয়ে আবার চলে যায় খোলায়। বেশ মজা লাগে খাদিজার। কী সুন্দর ছোট্ট ঠোঁটে ঘুমের মধ্যে চুঁক চুঁক করে মাই টানে। ওর মুখের দিকে তাকালে খাদিজা সব কষ্ট ভুলে যায়। রমজান তার সাত রাজার ধন এক মানিক, সারা জাহানের হাসি। হীরের টুক্রো ছেলেটা তার গোটা কলজে। দুধ খাওয়ানো শেষে দু'পাশে দু'টো ছোট্ট কোলবালিশ দিয়ে খাদিজা আবার ফিরে যায় খোলায়।

মরিচ তোলার ফাঁকে এক সময় প্রশ্ন করে খাদিজা–

– সনাতনদারা তালি চলিই যাবে?

– হ। প্রাণে বাঁচতি হলি পালানোই ভালো।

– আমাগেওতো রেহাই নাই। ইমাম হারামজাদা সিদিন কতো কী কলো? আমারতো ভয় হতিছে।

– কী যে করি, তা ভাবি কূল পাতিছি না। সনাতনদের সাথে ইন্ডিয়াতেই চলি যাবো না কি? শুনতিছি কতো মানুষ চলি যাতিছে। আবার মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিয়্যা যুদ্ধ করতি ফেরৎ আসতিছে দ্যাশে। যুদ্ধে যাবো নাকি, তাই ভাবতিছি। দূরে লঞ্চের শব্দ শুনে আঁৎকে ওঠে খাদিজা–

– লঞ্চের শব্দ মনে হতিছে? তালি কি মিলিটারি আসি পইড়লো?

– কী জানি? বেলাতো গড়িয়্যে গেলো। মিলিটারিগে আসার সময় কি আর রইয়েছে?

– তালি ভট্‌ভটির আওয়াজ হতিছে ক্যান?

এরই মধ্যে দূরে শোরগোল। চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ। ধোঁয়া। আগুন। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে জামাল-খাদিজা। 'তালি কি তাগো পাড়ায়ও মিলিটারি ঢুকিছে?' এক মুহূর্তও চিন্তা করার সুযোগ পায় না। উঠোনে তাকাতেই বুকের রক্ত জমে হিম। কালো বিরাট এক আলখেল্লা পরা ইমাম। সাথে মেম্বর। পেছনে বুটের ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ। জামালের মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী যেন মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে সমস্ত মগজ বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। বুকের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে চিৎকার দিয়ে ওঠে খাদিজা। ঝট্ করে জামাল খাদিজার মুখ চেপে ধরে। মরিচ ক্ষেতের ভেতর লুকিয়ে পড়ে। সামান্য চোখ জাগিয়ে আড়াল থেকে দেখে। কী যেন বলাবলি করছে ইমাম। দুদ্দাড় মিলিটারিরা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। তপ্ত কড়াইয়ে দেয়া জ্যান্ত কইমাছের মতো অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল খাদিজা। তার ছেলে, তার রমজান ঘরের ভেতর ঘুমায়। ছুটে যেতে চায়। জাপটে ধরে জামাল– টের পালি সব্বাইকে মারি ফেইলবো ওরা। রমজানরে কিচ্ছু কবি নানি। বাচ্চাগে মারি কী হবে? রমজানতো দুধের শিশু, মাসুম বাচ্চা; অরে মারবি নানি। তাগো কি কুনো দয়া-মায়া নাই? টু শব্দ করবি নে। তালি মরতি হবি।

মুখে বলে ঠিকই জামাল, কিন্তু তার ভেতরটা দাউ দাউ জ্বলে। কী করা উচিত– বুঝে উঠতে পারে না। মনকে প্রবোধ দেয় মনে মনে; আবার নিজেই ভাঙে প্রবোধ তীব্র আতঙ্কে। গোঙানির মতো অস্ফুট শব্দ বেরোয় খাদিজার কণ্ঠনালী চিরে– আমার রমজান, হায় আল্লাহ্!

কয়েক পলকের মধ্যেই ঘটে যায় ঘটনাটা। মিলিটারিরা বের হয়ে আসে ঘর থেকে। চোখে আশার আলো দেখতে পায় জামাল। ভাবে– হে আল্লাহ্, হে মাবুদ, মাসুম বাচ্চার উপর তালি মিলিটারিগে দয়া হলো? হাজার শোকর তোমারে। ঘর থেকে রেরিয়েই মিলিটারিরা কী যেন বলে ইমামকে। ইমাম তড়াক্ করে ঢুকে যায় বারান্দায়। রাগে হাঁসের বাক্সে মারে এক লাথি। দ্রাম্ করে এক শব্দ হয়। হাঁসগুলো ভয়ে প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ওঠে। ঝটিতি পকেট থেকে ম্যাচ বের করে, পিদিমের কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ঘরে। তারপর নেমে আসে মরিচ ক্ষেতের পাশে; পথে, অন্য বাড়ির দিকে। বিশাল কালো আলখেল্লার পেছনে ধুপ্‌ধাপ্ ভারি বুটের শব্দ।

মরিচ গাছের ভেতর মাথা ডুবিয়ে ফেলে জামাল আর খাদিজা। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ঘরের খড়ের চালে আগুন। দিশেহারা জামাল। তিন মাসের রমজান ঘরের ভেতর শোয়া। ঘুমুচ্ছে। 'তবে কি এতক্ষণ সে যা ভেবেছিল তা নয়? বাচ্চা বলে দয়া বা করুণা করল না তারা। এমনই নিষ্ঠুর তারা? এরা কি মানুষ? নাকি পশু? হায় খোদা, কী নিষ্ঠুর তুমি?' জামালের বুকের ভেতর অসংখ্য পাড় ভাঙার সপাসপ্ শব্দ। ইমামের প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে জামালের বাড়ি। ভেতরে ঘুমন্ত রমজান। অথচ তারা বেরুতেও পারছে না মরিচ ক্ষেত থেকে। বেরুলেই দেখে ফেলবে তাদের। মরিচ ক্ষেতের পাশেই, পথে দাঁড়িয়ে জ্বলে ওঠা বাড়ির দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি করে উঠছে মিলিটারিরা। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে জামাল আর খাদিজা। বেরুলেই গুলী। গোটা বাড়ি যখন জ্বলে উঠছে, তখন তারা ফিরে হাঁটা শুরু করল ইমামের পেছন পেছন।

ডুকরে কেঁদে ওঠে খাদিজা। ছুটে যেতে চায় রমজানকে আনতে। টেনে ধরে জামাল। ওই আগুনের মধ্যে সে যেতে দেবে না খাদিজাকে। জামাল নিজেই যাবে। টেনে ধরে খাদিজা। জামালকে যেতে দেবে না সে। সে মা। সে যাবে রমজানকে আনতে ওই আগুনের ভেতর। উন্মাদের মতো ছুটে যায়। পেছন পেছন ছোটে জামাল। দরোজার আগুন ভেদ করে খাদিজা ঢুকে যায় ঘরের ভেতর। এক ঝটকায় ছোঁ মেরে রমজানকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে আগুন থেকে বাইরে। দৌড়ে নেমে আসে বাড়ির নিচে। ছুটতে থাকে। পেছন পেছন জামাল। বনপোড়া হরিণের মতো তারা ছোটে আগুনের বিপরীতে। আগুন থেকে দূরে। আগুন যেন তার লেলিহান শিখায় চেটে নিতে চায় খাদিজা ও জামালকে।

পাকিস্তানি আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ ছুঁয়েছে ততক্ষণে। আগুনের লক্‌লকে জিহ্বা যেন পেছন থেকে তাড়া করছে ওদের। ছুটছে। আঁচ এসে লাগছে তাদের গায়। নিরাপদ দূরত্বে এসে ফিরে দাঁড়িয়েছে বাড়ির দিকে। রক্তিম আভায় ঝলসে উঠছে তাদের মুখ। যাক পুড়ে সব। তাদের রমজানতো বেঁচেছে! এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি রমজানের কথা। প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়েছে আগুন থেকে। বুকে দু'হাতে জড়ানো রমজান। মুখের কাছে এনে দিশেহারা, আনন্দ বিহ্বল মা চুমু খায় ছেলের মুখে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে খাদিজা– 'আমার রমজান! আমার রমজান!!'

জামাল স্তম্ভিত। পাথর। তাকিয়ে দেখে– খাদিজার কোলে রমজান নয়; রমজানের কোলবালিশ।

ভাতার মারা পাথার

এক

ড্রে ডু ডু ডু ডু ৎ ... টক্ ... টক্... হট্ ... হট্ ... হেই ... ট্রক্ ... ট্রক্ ... হুস্ ... হুস্ ... হেই ... জিভে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে করতে এবং বিড়বিড় করতে করতে কসিরুদ্দি ভাবে– ক্ষিদ্যাডা আইজ এট্টু আগে আগেই লাগছে। তেষ্টাও পাইছে খানিক। লতিফার আস্তি এ্যাহোনও ম্যালা দেরি। ভাত রানবেনে, বাগুন ভাজবেনে, টাহি মাছ দিয়া উস্তার তরকারি রানবেনে। তেঁতুলির টক বানাবেনে। তারপর গামলায় ভাত দিয়া তার উপারে সেগুলান পাতাবেনে। গামলার মদ্যিখানে, ভাতের মদ্যি এ্যাট্টা খোড়ল বানায়্যে ছোট্ট এ্যাট্টা ঘটিতি তেঁতুলির টক রাখপেনে। তেঁতুলির টক যা বানায় লতিফা– স্বাদই আলাদা। পানিতে তেঁতুল গুইল্যা তার মদ্যি লবণ আর গুঁড় মিশায়। তারপর যহোন নেবুর পাতা চটকাইয়্যা দ্যায়, তহোন তার স্বাদই পাল্টায়্যা যায়। গামলার উপার এ্যাট্টা থাল উবুৎ কইর‍্যা ভাত ঢাকপেনে। তারপর এ্যাট্টা ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়া শক্ত কইর‍্যা বান্দিয়্যা মাতায় মাডির কলসে এক কলস পানি ভইর‍্যা রওনা দেবেনে। তা এ্যাহোনও রওনা দিছে কিনা সন্দ অতিছে।

সে ভাবছে। যেন সে চোখের সামনে লতিফাকে হেঁটে আসতে দেখতে পাচ্ছে। সেই এক কাজ, এক দৃশ্য প্রতিদিন। কবে থেকে যে গরুর পেছনে গরুর মতো হাঁটা শুরু করেছে, মনে পড়ে না তা। কবে যে লাঙল ধরেছে হাতে, ভুলে গেছে সে সব। শুধু সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে হাতের কড়াগুলো। লাঙল ধরতে ধরতে বরইর বিচির মতো শক্ত হয়ে গেছে হাতের তালু। মানুষের হাত বলে ভুল হয়। বান্দরের পাছার মতো শক্ত। সকালের খাবার তার বাড়িতে হয় না। পাথারেই খেতে হয় রোজ। ক্ষিধে পেলে সেই একটু পর পর লতিফার পথের দিকে চেয়ে থাকা। কখন লতিফা আসে। কখন খাবার আসে। ভাতের কথা মনে পড়ায় ক্ষিধেটা সাপের মতো পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। আর তেঁতুলের টকের কথা মনে হতেই পানি এসে যায় জিভে। তৃষ্ণাটাও বেড়ে গেল আরও দশগুণ।

ক্ষিদ্যাডা আইজ হবিরে হবিরেই লাগছে। কসিরুদ্দি আকাশের দিকে তাকায়– বেইলওতো বেশি অয় নাই; হাত দুই এর পরে বিঘৎ খানেক উপারে উঠছে। তবু মাতার উপারে রৈদ চড়াক মারতিছে। চত্তির মাসের বেইল য্যান কেউটের বাচ্চা– ডিম ফুইট্যা বেরুতিই ফণা তুইল্যা ফোঁস করতি চায়। ক্ষ্যাতে যহোন আইসে তহোনও রৈদ চড়ে নাই। আন্দার থাকতি থাকতি রওনা দিছেলো। হাঁটতি হাঁটতি ঠ্যাং দুইড্যা বিষ। গরুর কান্দে লাঙল-জোয়াল জুইড়্যা যহোন সে নড়ি দিয়া পাছায় খোঁচা মারিছে তহোন ক্যাবল ডিমির কুসুমির নাহাল বেইলডা উঠছে।

বাঁ হাতে লাঙলের বাট, আর ডান হাতে বাঁশের নড়ি ধরা কসিরুদ্দি জোঁয়ালে বাঁধা গরু দু'টোর পেছন পেছন হাঁটে আর লাঙলের ফলাটা মাটিতে গেঁথে কালো ক্ষেতটাকে ফালিফালি করে ফেড়ে ফেলে। যেন ওরই মধ্যে লুকানো রয়েছে কসিরুদ্দির জীবন, বেঁচে থাকার রসদ। আর মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে– ড্র ডু ডু ডু ডু ৎ ... হট্ ... হট্ ... টক্ ... ট্ক ... হুস্ ... হুস্ ... হেই ...। মাঝে মাঝে নড়িটা সপাৎ সপাৎ লাগিয়ে দেয় গরু দু'টোর পিঠে কিংবা নড়ির মাথায় লাগানো সুচালো আল্ দিয়ে খোঁচা মারে গরুর পাছায়। গরু তখন আলের গুঁতোর ভয়ে দ্রুত ছোটে। মাঝে মধ্যে দৌড়ায়। তাতে বেশ তাড়াতাড়ি জমি চাষ করা হয়ে যায়।

– আর কোনোদিন তো এ্যাতো তরতরি ক্ষিদ্যা পায় না? ক্ষিধের কারণ খোঁজে কসিরুদ্দি। ভাবে– আইজ ম্যালা দূর হাঁইট্যা আস্তি অইছে। সে জন্যিই মোনে অতিছে ক্ষিদ্যাটা বেশি লাগছে। লতিফা চিনতি পারবেনে তো? ম্যালা দূরির পথ। পাতারের ঠিক মদ্যিখানে তার জমি। কোনো গাছপালা নাই কোতাও। বিরাট পাতার। তার য্যান কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। পুবি-পশ্চিমে দশ-বারো মাইলের মদ্যি আর উত্তর-দক্ষিণে সাত-আট মাইলের মদ্যি কোনো বাড়ি-ঘর নাই। ধূ-ধূ পাতার আর পাতার। বর্ষাকালে বারো-চোদ্দ হাত পানি অয়; লগি ঠাঁই পায় না। মোনে অয় সমুদ্দুর।

পাথারের পুবদিকে তিলবাড়ি, রাধাগঞ্জ, লাখিরপাড়; পশ্চিমে বলাকইর, ডেমাকইর, গান্ধিয়াসুর। উত্তরে কুমুরিয়া, ডুমুরিয়া, মাইছপাড়া, শ্যাওড়াবাড়ি, ডোমরাশুর; দক্ষিণে কাজুলিয়া, বাজুনিয়া, করপাড়া। কসিরুদ্দির গ্রাম মাইছপাড়া। এখান থেকে প্রায় তিন/চার মাইল দূরে। উত্তরে। কোনো বাড়ি-ঘর ঠাহর করা যায় না এখান থেকে। দূরের গ্রামগুলো কালো রেখার মতো মনে হয়।

কসিরুদ্দি ভাবে– এ্যাহোনও যদি লতিফা রওনা দেয়, তালিও আস্‌তি আস্‌তি পেরায় দুফার। পথ চিন্যা আস্‌তিই ঝামেলা। পাতারের মদ্যিখান থিক্যা জমির আইলের মতোন গেরামের কিনার দ্যাহা যায়। কিন্তু গেরামের কিনার থিক্যা পাতারের মদ্যিখানে কিছু দ্যাহা যায় না। খালি ধূ-ধূ-ধূ-ধূ পাতার আর পাতার। মদ্যিখানে কেউ থাকলিও তারে খুঁইজ্যা পাওয়া দায়। সে ভাবে– পাতারডার নাম কী? মাইন্‌সে কয় ভূতের পাতার। এ মুলুকের সকল ভূতে মিল্যা নাকি রাতির বেলা নেত্য করে। ভূতেগো আসর বসে। শনি-মঙ্গলবার অমবস্যার রাতে নাকি ভূতের কেত্তন অয়? আন্দার রাইতে নাকি আলোর নেত্য দ্যাহা যায়? ফস্‌ কইর‍্যা আগুন জ্বইলা ওঠে, আবার নিভ্যা যায়। আগুনের দলাগুলান হাঁটে। নাচে। এ সব মনে হতেই দিনের বেলাতেও কসিরুদ্দির গা ছম্‌ ছম্‌ করে ওঠে। গায়ে রোঁয়া ওঠে। লতিফাকে বুঝায়ে দিয়ে এসেছে– কামারবাড়ির পুব পাশ দিয়া পাতারের মদ্যি পইড়্যা সোজা দক্ষিণ মুহি হাঁটা দিবি। ডাইনে-বাঁয়ে চাবি না। খালি নাক বরাবর হাঁটপি আর হাঁটপি। হাঁটতি হাঁটতি হাঁপায়্যা উঠলি ভালো কইর‍্যা চারদিক চাবি। তালি কাউরে না কাউরে দেখতি পাবি। আমারেও দেখতি পাতি পারিস।

ভাবতে ভাবতে কসিরুদ্দি চারদিকে তাকায়– না, আইজ ধারে-কাছে কাউরে দেখতিও পাতিছে না। যদ্দূর দ্যাহা যায় খাঁ খাঁ পাতার আর পাতার। ম্যালা দূরে দূরে দুই একজনরে দ্যাহা যাতিছে। ছোড ছোড। লক্ষ্মণ দাসের সার্কাসে খেলা দেখানো বাওন মাইনসির মতোন লাগতিছে। গরু গুলানরে লাগতিছে বিলাইর মতোন। খাঁ খাঁ রোদ আর ধূ ধূ মাঠের ফাঁকা শূন্যতায় আর বিশাল নিস্তব্ধতায় তার ভেতর এক আদিম অনুভূতির জন্ম হয়। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে। মস্তিষ্ক থেকে সির্‌সির্‌ করে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে অদ্ভুত এক জৈবিক কামনা। মনে মনে ভাবে– লতিফা আস্‌লি আইজ এই ফাঁকা পাতারে জাপটে ধরবানে। দিনের বেলা লতিফার ঠোঁটে কুনোদিন চুমা খাই নাই। আইজ এক কাণ্ড করবানে।

ক্ষিধের কামড়ের সাথে তলপেটে অন্য এক কামড় অনুভব করে কসিরুদ্দি। উষ্ণ একটা বোধ তার সমস্ত শিরা-উপশিরা বেয়ে সির্‌সির্‌ করে দুরন্ত চিতার মতো সাঁতার কাটে রক্তে। হঠাৎ ক'রে এ সময় গরু দু'টো দাঁড়িয়ে পড়ে অকারণে। গাইগরুটা পেছনের পা দু'টো ফাঁক করে, বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে চড়চড় করে পেচ্ছাব করে দেয় তার লুঙ্গি ভরে। – কী গন্ধ আর কী গরম! এই গরমের মদ্যি আবার গরম। মেজাজটা তিরিক্ষি অইয়্যা ওডে। আবালটা এই ফাঁকে দেয় পাইখানা কইর‍্যা। গোমায়ের গন্ধ অবশ্য খারাপ লাগে না কসিরুদ্দির। খরখরে শুকনা মাডিডা ক্যাদা অইয়্যা গ্যালো। বিষ্টি অচ্ছে না ম্যালা দিন। এট্টু বিষ্টি অলি মাডিডা এ্যাতো ফাটতো না। লাঙল চালাতিও কষ্ট কম অতো। ফসলও ভালো অতো। গলাডা বুঁইজে আসতিছে। মাতার মদ্যি চনমন করতিছে। বেইল যতো উপারে ওডে, রৈদও ততো চড়তি থাহে। গরুর চোনাডা দুই আতে ধরি খালিও তো এট্টু তেষ্টা মেটতো। যদিও সেডা গরম আর বিশ্রী গন্ধ। কিন্তু গলাডা যে শুকায়্যা আসতিছে। চারদিকে কাউরে দেখতিও পাতিছে না।

আবার মনকে প্রবোধ দেয়– লতিফা এ্যাতোক্‌খেনে রওনা দেছে নিঘ্যাৎ। আর বেশিক্ষণ লাগার কতা না। বাকি জমিটুক চষি ফেলতি ফেলতি আইস্যা পড়বেনে। বড়জোর তিরিশ/চল্লিশটা ঘুল্লা দিলেই বাকি জমিটুক ফালা ফালা হইয়্যা যাইবেনে। লতিফা আসলি খাওন-দাওনের পর এট্টু জিরাইয়া দো'চাষ দেবানে। এ আর এ্যামোন কী? গাইডা এট্টু কাবু অইয়্যা পইড়ছে। আবালডা ঠিক আছে। জুয়ান বলদ। গায়ে শক্তি আছে। গাইডা তিন বিয়ানো। বয়েস অইছে। তায় আবার মেইয়েছেলে। মনে মনে বলেই কসিরুদ্দি ভাবে– গাইরে কি মেইয়েছেলে কয়? কওয়া যায়? হে তো আর মানুষ না? মাইনসের মেইয়েছেলে ভাগ আছে। কিন্তু গরুর? গরুর কি আছে? গরুরও তো মেইয়ে-পুরুষ ভাগ থাকতি পারে? তালি? কসিরুদ্দির কাছে বিষয়টা খোলশা হয় না। আপন মনে নানা কিছু ভাবে। ভেবে ভেবে ক্ষিধা-তৃষ্ণা থেকে মনকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

রৈদ বাড়ার সাথে সাথে কসিরুদ্দির মাথার টাক তেঁতে ওঠে। তার বউ রসিকতা করে বলে 'মাতার চান্দি'। রাগ করলে তার বউ কয়– চান্দি গরম অইছে নাকি? অতো মেজাজ দ্যাহাও ক্যান? কসিরুদ্দি মনে মনে একটু হাসে। মনে মনে ভাবে– পুরুষ মাইনসের এট্টু মেজাজ থাহা ভালো। বউকে সে বেজায় ভালোবাসে। মনে আছে– লতিফারে বিয়া কইর‍্যা যে বছর ঘরে আনে, হেই বছরই বন্যা অইছেলো। তা আইজ দশ-বারো বছরের কম না। ঘরের মদ্যি এক হাঁটু পানি। দুই হাত উঁচু কইর‍্যা টঙ বাঁধা ছেলো। বাঁশের ফালি কইর‍্যা, তাই দিয়া মাচানের মতো বানায়্যা তার উপার থাকতি অতো। কী যে অসুবিধা অইছেলো? দুইজনে জড়াজড়ি কইর‍্যা কোনোমতে শুইয়্যা থাকা যাইতো। পাশ ফিরতি অলিও সাবধানে ফিরতি অতো।

একদিন রাইতে গুমের গোরে লতিফা পানির মদ্যি পইড়্যা গেল। ঝপ্পাস কইর‍্যা একটা শব্দ অলো। আমার গুম ভাইঙ্গ্যা গেল। চাইয়্যা দেহি লতিফা পাশে নাই। কম্ব সারছে। লাফ দিয়া উইঠ্যা বসি। দেহি লতিফা ভিজা কাপুড়ে পানির মদ্যি আমার সামনে খাড়ানো। মচ্ছকন্যা। আমি সে কি হা-হা, হি-হি হাসি। লতিফাও হাসে। লতিফা কইছেলো– কুপিডা জ্বালাও। কাপুরডা পাল্টাই। আমি কইছেলাম– কুপি জ্বালানোর কাম নাই। আন্দার-কোন্দারেই কাপুড় পাল্টায়্যা ফ্যালা। ঘরে আর আছে ক্যাডায় যে লজ্জা পাস?

যেই কওয়া, সেই কাজ। কতি দেরি আছে, কত্তি দেরি নাই। চহির সামনে লতিফা কাপুড়ডা খুইল্যা ফ্যালাইলো। আন্দারে আমার চোখ দুইড্যা জ্বইল্যা উঠলো। এক ঝটকায় লতিফাকে বিছানায় তুইল্যা ফ্যাললাম। ভিজা গতরের পানিতে ক্যাঁতা-বালিশ ভিজ্যা গেল। আমিও ভিজ্যা গেলাম। হেই বছরই কমলা লতিফার প্যাডে আইসে। এ্যাহোন কমলার বয়স দশ/এ্যাগারো অইছে মনে কয়। কমলা ভারি ডাগর অইছে। আর চাইর/পাঁচ বছর পার হলিই বিয়া দিয়া দিতে অবে। বন্যার পানির কথা মনে হতেই আবার পিপাসাটা বেড়ে যায় কসিরুদ্দির।

মাথা থেকে ঘাম ঝরে। গা ভিজিয়ে স্রোত হয়ে পা বেয়ে নিচে নেমে মাটিতে মিশে যায়। শুষ্ক মাটি পানির স্বাদ পেয়ে কসিরুদ্দির পা জড়িয়ে ধরে। বৃষ্টিতে ভেজার কথা যে মাটির, তা কসিরুদ্দির ঘামে ভেজে। আর্দ্র হয়। পায়ে নির্মিত হয় কাদার জুতো। দেহের রক্ত পানি হয়ে পানির চাহিদা আরও বাড়িয়ে দেয়। কসিরুদ্দির কেমন পাগল পাগল লাগে। এদিক সেদিক তাকায়– কোথাও লতিফা নাই; কোথাও কেউ নাই। গাছ নাই, ছায়া নাই। প্রাণ নাই, পানি নাই। শুধু খাঁ-খাঁ ধূ-ধূ প্রান্তর; ঊষর প্রান্তর বিশাল। আর তার মাঝখানে তিনটা প্রাণী। দুইটা বোবা। একটা বোবার মতো। চিৎকার করে কথা বলে চলে গরুদের সাথে– হেই গরু, ক্ষিদ্যা লাগছে; পানি খাবি? কোতায় পাবি? চালিই কি পাওয়া যায়? আর এট্টু সবুর কর; আমার বউ লতিফা আস্‌তিছে, কলস ভর্তি কইর‍্যা পানি আনবেনে। তহোন খাতি পারবিনে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, পেচ্ছাব করে নিজের পেচ্ছাব নিজে খেলেও তো কিছুটা তেষ্টা মেটে। যেমনি ভাবা, তেমনি করা। শালার পেচ্ছাবও বেইমানি করে। রোদ দেহ থেকে নিংড়ে নিয়েছে সমস্ত পানি। উষ্ণ পীতবর্ণের দু'চার ফোঁটা পেচ্ছাব তার করতলও ভেজাতে পারে না। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাই-ই সে চেটেপুটে খায়। নিজের কাছেই নিজেকে বন্য মনে হয়। কসিরুদ্দির মাথার ভিতর পাক খায় বোধ। গোত্তা মারে তেষ্টা। পেটের গভীর গভীর ভেতর থেকে অগ্ন্যুদ্‌গারের মতো নাড়ি-ভুড়ি মোচড় দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় বমি। গোটা পাথারটা দুলতে থাকে প্লাবনে পড়া ডিঙ্গি নৌকার মতো। মাথা ঘুরতে থাকে। কোটর ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় চোখ।

ক্ষিধে এবং তৃষ্ণা থেকে তার মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায় কসিরুদ্দি। তাই গরুর সাথে কথা বলে। এ কথা সে কথা ভাবে। পুরনো কথা মনে করে– শুধু গাইটা দিয়া হাল চষতি কী না কষ্টটাই অতো আগে। গাইটার সাথে খানিক কসিরুদ্দি জোয়াল টানতো; তহোন লতিফা লাঙল ধরতো। আবার মাঝে মাঝে লতিফা জোয়াল টানতো; তহোন কসিরুদ্দি লাঙল ধরতো। এরকম কইর‍্যা চলতো। গাই বিয়াইলে দুধ বেচতো। সেই দুধ ব্যাচা ট্যাকা জমাইয়্যা জমাইয়্যা লতিফা একটা বলদ কেনার স্বপ্ন দ্যাখতো। একদিন আফজাল মাহাজনে সাইধ্যা সাইধ্যা কয়– এ্যামোন কষ্ট করতেছোস ক্যান? বউডারে খাডাইয়া মারবি? দুধ ছাড়ান দিলে বাছুরডা বেইচ্যা দে। অইডা বেইচ্যা যা পাস, তার সাথে আমি কিছু দেবানে– তা দিয়া এ্যাট্টা আবাল কেন। সুদ দিতে অবে না। যহোন পারোস দিস; হ্যার লাইগ্যা চিন্তা করিস না। বুজ্‌জস্‌নি, তর বউয়ের দিকে চাইয়াই ট্যাকাডা দিলাম। নইলে ... খাইট্যা খাইট্যা টান টান শরিলডা ক্যামোন শুটকি মাইর‍্যা গেছে।

কথাটায় একটা খারাপ ইঙ্গিত টের পায় কসিরুদ্দি। ভেতরটা জ্বলে ওঠে দপ্ করে। তবু বুঝেও না বোঝার ভান করে। সে ভাবে– হে আসলে অতো বলদ না। মাহাজনের মতলবডা বুঝতি পারে। হ্যার আতে কল্কি থুইয়া মাহাজনে তামাক খাইতে চায়? মজা মারতে চায়। কসিরুদ্দি কি অত্তো বেকুফ? তবু সে রাজি হয়ে যায়। বাছুর বিক্রির টাকা, দুধ বিক্রির টাকা মিলে তারপরও যা কম পড়ে, তা মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে এই বলদটা কিনে ফেলে। এটা তার নিজেরই বলদ। মাহাজন খালি কডা ট্যাকা পাবে, তা সে দিয়্যা দেবেনে। বতর পড়লি মাইনসির জমিতি লাঙল চালাবার ডাক পইড়বিনে। তহোন এট্টু বেশি খাটলি ট্যাকা যোগাড় হইয়্যে যাবিনে। মহাজনের ট্যাকা সে দিয়া দিবেনে।

কিন্তু ক্ষিধে, পিপাসা আর রোদে সে বেশিক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারে না নিজকে। ক্ষিধে আর পিপাসা দু'টো যেন সাপের দু'টো জিভের মতো হিস্ হিস্ বেরিয়ে আসে নাক, মুখ, চোখ দিয়ে। জিভটা যেন শুকনো একফালি কাঁথা। গলার কাছে দলা পাকিয়ে রয়েছে তৃষ্ণা। চৌচির মাঠে একবিন্দু শিশিরও নেই কোথাও। তার চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। সূর্যটা ততক্ষণে ঠিক মাথার উপরে উঠে আসছে। ঠিক দুপুর। মাথার চান্দি ফুটো করে মগজের মধ্যে ঢুকে যায় সূর্যের ফলা। চিৎকার করে গালাগাল দেয়– এই কুত্তার বাচ্চা বেইল, এ্যাত্তো ত্যাজ দ্যাহাস্ ক্যান। হালার কোনো ম্যাগও নাই, কোনো ছায়াও নাই। টিকতে না পেরে পরনের লুঙ্গিটা খুলে মাথায় পেঁচিয়ে নেয় কসিরুদ্দি। গামছাডা থাকলি অবশ্য সেডা পরতি পারতো; তা ভুলে ফ্যালায়ে আইস্ছে বাড়িতি। এই ফাঁকা পাতারে আবার লজ্জা কীসের? ক্যাডা-ই-বা দেখবে? দেখে, গরু দু'টো হাঁটা বন্ধ করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। একটু লজ্জা পেতে গিয়েও পেলো না। ওরা তো গরু। মানুষ তো না। গরুর কাছে লজ্জা কী?

সেও বস্ত্রহীন গরুর মতো বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে। গরু আর নিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। গরু দু'টো হাঁটে না। এতটুকু নড়ে না। যেন তারা হাঁটতে ভুলে গেছে। বহুকাল আগে কোনোদিন হেঁটেছিল হয়তবা। দাঁড়িয়ে থাকে জয়নুলের আঁকা ছবির গরুর মতো। স্থির। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাথরের তৈরি কোনো পুরনো ভাস্কর্য। পেছনে কসিরুদ্দি আর এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম।

কসিরুদ্দি বুঝতে পারে– ওদেরও কষ্ট হয়েছে। কাঁধে জোয়াল থাকলেও তার থেকে লাঙলটা খুলে নেয়। গরু দু'টো ঝিম ধরা গাছের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেন হাঁটতে ভুলে গেছে বহু বহু কাল। কসিরুদ্দি কষ্টটা ভাগাভাগি করে নেয়। নিজের কষ্ট ভুলে গরু দু'টোকে আদর করে। গলকম্বলে হাত বুলায়। চুমু খায়। তারপর একটু ছায়ার খোঁজে গাই গরুটার ছায়ার নিচে নিজেকে সঁপে দেয়। গরুটা যেন বৃক্ষ। মাথা থেকে লুঙ্গির পাগড়িটা খুলে ফেলে। গাইটার নিচে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র বসা কসিরুদ্দিকে দূর থেকে বাছুর ভেবে ভুল হয়। লতিফার ওপর তার ভীষণ রাগ হয় এবার। ভাবে– সে এলে এই বাঁশের নড়ি দিয়ে সপাৎ সপাৎ তার পাছায় কয়েক ঘা লাগিয়ে দেবে। পিটিয়ে পাছার ছাল তুলে নেবে। আবার ভাবে– পথ ভুলে গেল কি না? তাহলে তো সর্বনাশ! গরুর ছায়ায় বসে পথহীন পথের দিকে তাকিয়ে কসিরুদ্দি তার দিকে এগিয়ে আসা চলন্ত কোনো বিন্দু খোঁজে– যে বিন্দুটা এগিয়ে আসতে আসতে লম্বা হবে– লম্বা হতে হতে একজন মানুষ হবে– মানুষ হতে হতে একজন মহিলা হবে– মহিলা হতে হতে লতিফা হবে– তার স্ত্রী লতিফা। তার মাথায় মাটির কলসে এক কলস ঠাণ্ডা পানি; হাতে গামছা কিংবা লুঙ্গিতে বাঁধা গামলায় এক গামলা ভাত-তরকারি। তার মধ্যে নেবুর পাতা দিয়ে তৈরি এক ঘটি তেঁতুলের টক– উহ্! ভাবতেই মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে– জিভে পানি আসার বদলে তা শুকনো চামড়া হয়ে যায়।

মাথার ভেতর নৃত্য করে চৈত্র মাসের রোদ। চোখে জ্বলে তৃষ্ণা পোড়া ধোঁয়া। তবু– তবু সে চলন্ত এক বিন্দু খোঁজে দৃষ্টির সীমায়। চোখে অজস্র বিন্দু নৃত্য করে। বুঝতে পারে না এর মধ্যে কোনটা লতিফা। কালো বিন্দুগুলো একটার সাথে একটা মিলে মিশে জমকালো অন্ধকার হয়ে ওঠে। আবার ফিকে হয়– আবার জমাট বাঁধা গাঢ় আলকাতরা। কালো কালো বিন্দুগুলো জোঁকের মতো বাড়ে-কমে। এরকম কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ খেয়াল হলো– একটা বিন্দু যেন তার দিকেই এগিয়ে আসতে আসতে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। গা ঝাড়া দিয়ে দ্রুত উঠে বসে কসিরুদ্দি। চোখ টেনে বড় বড় করে তাকায়। ঝাপসা চোখে সন্দেহ দোলে। চোখ দু'টো ভালো করে রগড়ে আবার তাকায়– সত্যিই তো, লম্বা হয়ে যাওয়া বিন্দুটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে যেন।

দুই

চত্তির মাসের রৈদে হাল চষার পর তিতা শাকের ঝোল দিয়া ভাত খাতি ভারি ভালো লাগে। কসিরুদ্দির ভারি পছন্দ। তাই সকালবেলা ক্ষেতের থেকে কতগুলো ডিমিশাক তুলে আনতে কমলাকে পাঠিয়ে দিয়ে লতিফা খোলায় যায়। উচ্ছে গাছ উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ডাঙর ডাঙর কয়েকটা উচ্ছে ছিঁড়ে নিয়ে আসে। আর কয়েকটা বেগুন। উচ্ছের তরকারি, ট্যাংরা মাছ দিয়ে ডিমিশাকের ঝোল, আর বেগুন ভাজা করবে লতিফা। তরকারি কেটে নাড়া দিয়ে চুলায় আগুন ধরায়। কমলা ডিমিশাকগুলো রেখে এক ছুটে দৌড়ে যে কোথায় গেল?

– নুনডা, ত্যালডা ক্যাডা-ই-বা আউগাইয়্যা দেয় ?

– কী সমেস্যা, এ্যামোন সময় আফজাল মাহাজন আইস্যা হাজির। বসতি না বললিও এট্টা পিড়া টাইনা নিজেই বইস্যা পড়ে লতিফার গা ঘিঁসস্যা। পাছার কাছের থোন মোডে নড়ে না। চুলার গরম। তারপরে আবার কান গরম করা কতা হুইন্যা মেজাজডাই গরম অইয়া ওডে। লতিফা ঘরে গ্যালে, হেও সাথে সাথে যায়; লতিফা বাইরে গ্যালে, হেও বাইরে যায়। পাছে পাছে খালি ঘুর ঘুর করে। ছোঁক ছোঁক করে। তার দেরি অইয়া যায়। মাহাজন কয়– আবালডা কিন্যা দিলাম, তার এ্যাট্টা পেরতিদানও দিলি না? এ্যাহোন তো আর গাই গরুর সাথে আর এ্যাট্টা গাই গরুর মতোন তোর জোয়াল কান্দে নিয়া টানতে অয় না? শরিলে তোর চেকনাই ফেরছে।

– আপনে এ্যাহোন যান। মানুষটা গ্যাছে পাতারে। খাওন নিয়া যাইতে অবে শিগ্‌গির। বেইল অইছে।

– হেডা তো আমি জানিই। না জাইন্যা হুইন্যা আইস্‌ছি নাকি? অত বোকা ভাবোস ক্যান?

– কী কতা কন? আমার তরতরি যাইতে অবে।

– আমি কি না করছি নাকি? তোর কাম তুই কর। আমি দুই-চাইরডা সোহাগের কতা কইতেছি। ব্যাজার হস্ ক্যান?

– সোহাগের কতার কাম নাই আমার। আপনে আপনের কামে যান।

মহাজন রান্নাঘরে পিড়ি টেনে শেকড় গেড়ে বসে। লতিফার কাছ থেকে নড়ে না। লতিফার রান্না দেখে। না খেয়েই রান্নার প্রশংসা করে। রান্নার নয়, রান্নার ঘ্রাণের। লতিফার রান্না দেখে নয়; লতিফাকে দেখে। তার রান্না নয়; তার প্রশংসা করে। লতিফার শরীরের প্রশংসা করে। কুকুরের তাড়া খাওয়া বিড়ালের মতো লতিফা আপন মনে ফুঁসতে থাকে। আপন মনে গজগজ করতে থাকে।

এই মহাজন ঘটিত কারণে রান্না করতে দেরি হয়ে যায় লতিফার। তারপর গামলায় খাবার সাজায়ে বাড়িতে ফেলে যাওয়া কসিরুদ্দির গামছাটা দিয়ে গামলাটা ভালো করে বাঁধে। এক হাতে গামলাটা ধরে, মাটির কলসে এক কলস পানি ভরে মাথায় তুলে নিত্যদিনের মতো মাঠের দিকে ছোটে। কমলাকে ডেকে ঘরে বসিয়ে রেখে যায়। কমলাও বায়না ধরে মা'র সাথে মাঠে যাবার। মাঠে গেলে বাজানের সাথে মাঠের মধ্যে বসে ভাত খেতে পারে। পাথারে মাটিতে বসে খেতেই মজা। ঘরে বসে খেতে অত মজা লাগে না। পাথারে খাবারের স্বাদই যেন পাল্টে যায়। কিন্তু দূরের পথ বলে লতিফা কমলাকে সাথে নেয় না। একাই রওনা দেয়।

কামারবাড়ির পাশ দিয়ে পাথারে নামে লতিফা। তখন বেলা হয়ে গেছে বেশ। নিজেও কিছু খায় নি তখনও। খাবার সময়ও পায় নি। অন্য দিন ক্ষেত থেকে বাড়িতে ফিরে খায়। আজ দূরের পথ বলে পাথারে বসে একই সাথে খেয়ে নেবে ইচ্ছে। বুক দুরুদুরু করছে– না জানি আইজ কপালে কী শনি আছে? কসিরুদ্দি কইছেলো– সোজা দক্ষিণ মুহি হাঁটতি। হাঁটতি হাঁটতি যহোন কষ্ট অবে, তহোন ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতি অবে। তালিই দেখতি পাবি।

লতিফা সোজা দক্ষিণে চলে। সোজা। কিছুদূর যাবার পর লতিফা বুঝতে পারে না– আসলে কোনটা সোজা, কোনদিকে সোজা। সূর্য মাথার ওপর। কোনদিকে উত্তর, কোনদিকে দক্ষিণ; কোনদিকে পূর্ব, কোনদিকে পশ্চিম– ঠাহর করতে পারে না। ঠাহর করা যায় না। শুধু সামনের দিকে হাঁটে। সোজা হাঁটে। কিন্তু সেই সামনের দিকটা কখন পেছন হয়ে যায়; সেই সোজাটা কখন মাকড়সার জালের মতো বৃত্তাকার হয়ে যায়– লতিফা তা বুঝতে পারে না। বুকের ভেতর থেকে বমির মতো কান্না উঠে কণ্ঠে দলা পাকিয়ে যায়। সে কী করছে; কোথায় ছুটছে? চারদিকে তাকাচ্ছে– কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সে থামছে না। আবার সোজা হাঁটছে।

এক সময় দূরে, বিড়ালের সাইজের দু'টো গরু দাঁড়ানো দেখতে পায় সে। সেই বরাবরই সে হাঁটতে থাকে। বিড়াল দু'টো বড় হয়। ক্রমশ দু'টো কুকুরের মতো হয় গরু। কিন্তু কোনো মানুষ দেখে না। হাঁটতে থাকে। তার পা ব্যথা হয়ে যায়। হাঁটতে থাকে। তার মাথা ঝিমঝিম করে। হাঁটতে থাকে। তার বুক দুরুদুরু করে। হাঁ ট তে থা কে হাঁ ট তে থা কে হাঁ ট তে থা কে ... দৃশ্যটা আস্তে আস্তে বড় হয়। এক সময় সে আবিষ্কার করে– গরুর ছায়ায় একজন মানুষ বসে। দূর আরও নিকট হয়। দৃশ্যটা স্পষ্ট হয়। গরু দু'টো সে চিনতে পারে। চিনতে পারে তার ছায়ায় বসে থাকা শুকনো কসিরুদ্দিকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় লতিফা। খুঁজে পাওয়ার আনন্দে; আবিষ্কারের আনন্দে। সাথে সাথে আবার ভয়ও জাগে– যদি রাইগ্যা যায়? রাইগ্যা গ্যালে আর হুঁশ থাহে না মানুষটার। অচেনা লাগে। না জানি আইজ কী আছে কপালে? বুক দুরুদুরু করছে। ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। বারুদের মতো আনন্দটা এক মুহূর্তে ফস্ করে জ্বলে উঠে আবার দপ্ করে নিভে যায়।

তিন

দিনের বেলাতেই এবার সত্যি ভূতের নাচন শুরু হয় কসিরুদ্দির চোখে। সে দেখতে পায়– চলন্ত বিন্দুটা একবার গোল হয়; একবার লম্বা হয়। একবার থামে; একবার হাঁটে। একবার লতিফা হয়; আর একবার ভূত হয়। এখন আর তার ক্ষিধেও নেই; তৃষ্ণাও নেই। রাগও নেই, বিরাগও নেই। ভয়ও নেই, ভাবও নেই। গায়ে সম্পূর্ণ সুতোশূন্য কসিরুদ্দি গরুর ছায়ায় বসে মাথা চুলকায়। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গাইটার ওলানে মুখ লাগায়। প্রাণপণে চুষতে থাকে গাইটার শুকনো খট্খটে বাঁট। তাতে একফোঁটা দুধ নেই; এক বিন্দু পানি নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। বাহ্যজ্ঞানশূন্য কসিরুদ্দি গরুর পাশে গরু হয়ে হামা দেয়। গরু দু'টো তার চেনা চেনা লাগে। কোথায় যেন দেখেছে মনে হয়। মনে হয়, একটা তার স্ত্রী। লতিফা। তার বুকে কোনো দুধ নেই। খটখটে শুকনা মাই। অন্যটা তার ভাই। খুব ছোটবেলায় মারা যাওয়া তার ভাই। তার ভাই যেন তাকে নিতে এসেছে। কসিরুদ্দি তাদের পাশে হামাগুঁড়ি দিয়ে হাঁটে। হাম্বা হাম্বা করে। গরু দু'টোও আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে এক সময় শুয়ে পড়ে। ভাব-লেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে দূরে। ঝুলে পড়ে জিভ। কশ বেয়ে ঝরে পড়ে লোল।

কসিরুদ্দির চোখ থেকে হঠাৎ একটা আবরণ সরে যায়। যেখানে ঢেউ খেলছিল তাঁতানো রোদ, সেখানে দুলছিল এক ছায়ামূর্তি। দৃষ্টির সীমানায় দেখতে পায় লতিফাকে। ঢেউয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ছায়া ছায়া নারী। তার দিকে এগিয়ে আসছে লতিফা। তার বউ। তার খাবার। তার পানি। তার প্রাণ। অকস্মাৎ চেতনা ফিরে পায়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় অদ্ভুত মানুষ। নড়িটা হাতে নিয়ে আত্মহারা হয়ে, গরু দু'টোর পিঠে সপাৎ সপাৎ দু'টো ঘা মেরে 'লতিফা' বলে চিৎকার দিয়ে উন্মাদের মতো ছুট লাগায় লতিফার দিকে। গরু দু'টো ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘুরে তাকিয়ে থাকে কসিরুদ্দির দিকে।

কসিরুদ্দি সম্পূর্ণ আদিম একজন মানুষ, আদিম চাষী; নড়ি হাতে উদ্‌ভ্রান্ত ছুটে যায় লতিফার দিকে। লতিফা ভয় পেয়ে যায়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ কসিরুদ্দি নড়ি হাতে চিৎকার দিয়ে ছুটে আসছে লতিফার দিকে। এ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না লতিফা। অকস্মাৎ চেতনা লুপ্ত হয় তার। লতিফা কী করবে, বুঝে উঠতে পারে না। থ' মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। উল্কার মতো ধেয়ে আসে কসিরুদ্দি। সে যেন ক্ষ্যাপা উন্মাদ। সব তছনছ করে দেবে। লতিফা ভয়ে হাতের খাবার, মাথার কলস ফেলে উল্টো দৌড় লাগায়। গামলার ভাতগুলো গামছা ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে বাইরে। জুঁই ফুলের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে কালো চষা জমির উপর। মাটিতে, ঢেলার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে যায় তেঁতুল টকের ঘটি। মাথা থেকে কলসটা পড়ে খান খান। তৃষ্ণার্ত মাটি দ্রুত শুষে নেয় পানি। বসুন্ধরাও যে তৃষ্ণার্ত অনন্ত অনন্তকাল। পানি পান করে মাটি সিক্ত হয়ে কর্দমাক্ত। গরু দু'টো ছুটে আসে কসিরুদ্দির কাছে।

প্রাণভয়ে লতিফা ছোটে। আজ বুঝি কসিরুদ্দি তাকে মেরেই ফেলবে। লতিফা ছুটছে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। এক ঝটকায় খুলে ফেলে। গায়ে সায়া-ব্লাউজের কোনো বালাই না থাকায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ লতিফা প্রাণভয়ে ছোটে, যেন বন্য পশুর তাড়া খাওয়া লক্ষ বছর আগের কোনো আদিম নারী। পেছনে ধেয়ে আসে কসিরুদ্দি, আদিম গুহা মানব। পেছন ফেরে না। লতিফা ছোটে। ছোটে। ছোটে। বেশ কিছুটা ছোটার পর পেছন ফিরে একবার তাকায়।

লতিফা স্তম্ভিত হয়ে যায়। পা দু'টো ভারি পাথর। এ সে কী করেছে? দেখে– মাটিতে উবু হয়ে বুভুক্ষু উন্মাদের মতো ভাঙা কলসির চাড়িতে ছিঁটে ফোঁটা জমে থাকা পানি চেটেপুটে খাচ্ছে কসিরুদ্দি। যেন কতকাল খায় নি কিছুই। মাটি থেকে মুঠো মুঠো তুলে খাচ্ছে ছড়ানো ছিটানো ভাত। তেঁতুল গোলা টক মেশানো কাদায় মুখ ডুবিয়ে, নাকে-মুখে কাদা মেখে, খাচ্ছে কাদা হওয়া টক পানি। পাশে এসে গরু দু'টোও তেমনি খাচ্ছে কাদা মেশানো পানি। দূরে পড়ে রয়েছে গরু তাড়াবার নড়ি, লতিফার ভয়।

পাথর লতিফা প্রাণ ফিরে পায়। সহসা সংবিৎ ফিরে এল। হায় আল্লাহ্ বলে ছুটে আসে কাছে। কসিরুদ্দির মাথাটা তুলে নেয় কোলে। কিন্তু তার কোলে কোনো পানি নেই। কাদায় মাখামাখি কসিরুদ্দিকে ভূতের মতো লাগে। গলায় কাদা আটকে গরুর মতো কেমন এক গোঁ গোঁ আওয়াজ। লতিফা কী করবে, বুঝে উঠতে পারে না। যেন দূর কোনো অন্ধকারে পুরনো ভাঙা দালানের নিচে চাপা পড়া কোনো গোঙানির মতো কসিরুদ্দির মুখ থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরয়– পা ... নি ...। কিন্তু পানি কোথায় পাবে লতিফা? ঝট্ করে কসিরুদ্দির মুখে তুলে দেয় তার শুকনো পুরনো মাই। তাতে দুধ নেই; পানি নেই। লতিফা পাগল হয়ে ওঠে। কাদা ছেনে পানি বের করে আনতে চায় হাতে। কাদায় মাখামাখি হয় হাত। পানি ওঠে না। আবার তার মাথাটা তুলে নেয় কোলে। কসিরুদ্দির নিস্তেজ মাথাটা কাৎ হয়ে ঝুলে পড়ে লতিফার কোলে। লতিফার শূন্য দৃষ্টি শূন্য আকাশে মেঘ খোঁজে। গরু দু'টো তাকিয়ে থাকে নির্বাক। যেন ওরাও বোঝে পৃথিবীর কষ্ট।

সম্পূর্ণ আদিম চারটে প্রাণী নির্বাক, নিথর পড়ে থাকে খটখটে শুকনো রৌদ্র-পাথারে।

চারকাঠা জমি

এক

ছিলিম থেকে মুখ খসালো বটুককাকু। চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল– ভারি সুন্দার কবিতা তো!
চেয়ে দেখলাম তার দু'চোখে স্মৃতিকাতর জল।

সে অশ্রু থেকে আজকের দূরত্ব ছাব্বিশ বছর। পানকৌড়ির মতো ছেলেবেলা ডুব দিয়েছে অতলে। জাগল এতদিন বাদে। সেই গ্রাম, সেই পায়ে হাঁটা পথ; মটরশুঁটির ক্ষেত, সর্ষের হলুদ পাথার, গমক্ষেত পেরিয়ে সে পথ চলে গেছে বৈকুণ্ঠপুরের দিকে। আমি এখন নাগরিক মানুষ। ভুলে গেছি ওই পথে হাঁটা আজ ছাব্বিশ বছর।

দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ। আমাদের গ্রামের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। ফ্যান নিয়ে কুকুরের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে যেত মানুষে মানুষে। খুব কম লোকই ছিল, যারা পেট ভরে খেতে পেত। মাঠ থেকে কুড়ানো শাকপাতার সাথে সামান্য আটা জলে গুলে লবণ দিয়ে 'লেউ' রান্না করে খেত অধিকাংশ মানুষ। সারা গ্রামে এটাই ছিল প্রধান এবং একমাত্র খাদ্য। দু'বেলাই। যাদের তাও জুটত না, তারা কোনো বাড়িতে ভাত রান্না হলে সেখান থেকে ফ্যান চেয়ে খেত।

ভাত ছাড়া আমার চলত না। আমাদের বাড়িতে তাই ফ্যান হতো। সন্ধে হই হই হতেই কয়েকটা গামলা-বালতি জড়ো হয়ে যেত বাড়িতে। ফ্যান নিতে যারা আসত, তারা সবাই আমার সমবয়সী প্রতিবেশী। ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত ফ্যান নিয়ে। দেখে ভারি কষ্ট হতো আমার। মা হয়ত আমার কষ্টটা বুঝত বা তাঁরও কষ্ট হতো, তাই ফ্যানের সাথে কিছু কিছু ভাতও মিশিয়ে দিত, যেন ভাতগুলো ফ্যানের সাথে এমনিই পড়ে গেছে, এমন ভাবে। তাছাড়া তাদের কাউকে কাউকে কিছু না কিছু একটা খাইয়ে দিত। আমার ভালো লাগত।

আমাদের ক্ষেতে প্রচুর কুমড়ো হয়েছিল সেবার। প্রতিদিনই মা দু'চারটে কুমড়ো কাউকে না কাউকে বিলিয়ে দিত। তারপরও এমন কোনো রাত ছিল না, যে রাতে দু'চারটে কুমড়ো চুরি না যেত। সারাদেশে অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছিল চুরির উপদ্রব। ডাকাতিও। রাতে পাহারা দিতে হত। তাতেও রক্ষে ছিল না। প্রায় দু'বিঘে জমি জুড়ে বিশাল কুমড়ো ক্ষেতটার ওপর নজর পড়েছিল মানুষের।

এক রাতে মা হাতে নাতে ধরে ফেলল একজনকে। মাঝারি ধরনের একটা কুমড়ো চাদরের তলে করে এক লোক নিয়ে যাচ্ছিল লুকিয়ে। মা দেখে ফেলল।

– বটুক, দেখি তোর চাদরের তলে কী?

– না রাঙাদি, কিছু না।

দেবর সম্পর্কীয় সবাই মাকে বৌদি না বলে 'রাঙাদি' বলত। 'কিছু নাই?' –বলে চাদর টান দিয়ে সরিয়ে ফেলল মা।

– এটা কী?

বাচ্চা ছেলের মতো বটুক ভেউ ভেউ করে কেঁদে দিল–

– রাঙাদি, কোনোদিন আমারে কিছু চুরি করতে দ্যাখছো? আইজ দুইদিন ছাওয়াল মাইয়া লইয়া না খাইয়া রইছি। ফ্যানও পাই নাই কোনোহানে। আমরা না খাইয়া থাকতারি, ওরাতো পারে না। সারাদিন ক্ষিধায় কানতেছে। কতায় কয়, অভাবে স্বভাব নষ্ট। আর পারলাম না রাঙাদি, তাই শ্যাষ ম্যাষ . . .

মা'র চোখ ছল ছল করে উঠল। সেই রাতের অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল, মা কাঁদছে। বটুককে বাড়ি ডেকে নিয়ে এলো। কুমড়োটার সাথে বটুকের চাদরের একপাশে কিছু চাল, আর একপাশে কিছু আটা বেঁধে দিয়ে মা বলল– এবারে বাড়ি যা।

ছেলে মানুষের মতো বটুক হাউমাউ করে কেঁদে দিল–

– রাঙাদি, রাঙাদি . . . আর কিছু বটুকের মুখ দিয়ে বের হলো না। বটুক চলে গেল। দেখলাম, মা আঁচলে চোখ মুছল এবং বাবাকে কী যেন বলল।

দুই

কুমড়ো ক্ষেতের এক কোণায় বটুকের বাড়ি। ছোট্ট। খড়ের চালের ঘর। এক মেয়ে, দুই ছেলে নিয়ে বটুকের সংসার। মেয়েটি বড়। খালি গা ফেলে সবে ফ্রক ধরেছে। নাম আদুরী। ছেলে দু'টো আমার থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোট। আমি সবে প্রাইমারি ছেড়ে হাইস্কুলে পা দিয়েছি। সিক্সে।

কুমড়ো ক্ষেতের দক্ষিণ পাশে ছোট খাল। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জল থাকে না। খালের ওপারে হাইস্কুল। খেলার মাঠ। পাঁচ নম্বরের একটা ফুটবল ছিল আমার। রোজ সকালে ফুটবল প্র্যাকটিস্ করতাম সেই মাঠে। বটুককাকুর দুই ছেলে ছিল আমার খেলার পার্টনার। ওদের কোনো পোশাক থাকত না গায়ে। ফাল্গুন মাসেও ভোরবেলা বেশ কুয়াশা পড়ত সেই সময়। চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত শীত থাকত। ওদের কোনো শীত ছিল না। খেলা নয়, দুষ্টুমিই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। বল দূরে চলে গেলে এনে দিত। শিশিরে-কাদায় মাখা বলটা আমার গায়ে ছুঁড়ে মারত। আমার গায়ে কাদা মাখানোতেই ওদের তৃপ্তি। ততক্ষণে ওরা নিজেরাই কাদা মেখে ভূত। রোজই আমাকে স্নান করতে হত খেলা শেষে। ওরাও করত। মজা পেত খুব। স্নান শেষে উঠে যেত। গায়ের জল গায়েই শুকাত। সর্দি-কাশিও হতো না কখনও। স্নান শেষে কুয়ো থেকে উঠতেই রোজ আদুরীর সাথে দেখা হতো। মুচকি একটু হেসে দিয়ে দৌড়ে যেত। ও হাসিতে কী ছিল, কী ছিল না; তা বোঝার বয়স আদুরী কিংবা আমার কারোরই নয়।

দূরে কোথাও মাটি কাটার কাজ করত বটুককাকু। দু'এক সপ্তাহ পরপর বাড়ি আসত দু'একদিনের ছুটি নিয়ে। এসেই ফুর্তি করে বাজার– মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, কলা, পিঠে, পায়েস ইত্যাদির আয়োজন। সে ক'দিনের রোজগারের জমানো টাকা একদিনেই শেষ। তারপর সারা সপ্তাহ উপোস। এই উপোসের পর আবার হঠাৎ অত গুরুপাক খাওয়ার ফলে সব ক'জনের হতো ডায়রিয়া। বটুককাকু ছিল বেহিসেবি এবং অপরিণামদর্শী। তাই প্রায়ই পুনরাবৃত্তি ঘটত এ ঘটনার। ফলে ছেলে-মেয়েরা হয়ে উঠেছিল জয়নুলের ছবির মতো। একবার এরকম ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বটুক কাকু বিছানায় পড়ে ছিল বেশ কিছুদিন। কাজে যায় নি বলে এবং অসুস্থ বলে কন্ট্রাক্টর তাকে বিদেয় করে দেয়। গ্রামেও কোনো কাজ না পেয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে বটুককাকু। তাই না খেয়ে থাকার পালা।

সে রাতের পর আমাদের কাজে বহাল হয়ে গেল বটুক কাকু। জমি চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার তদারকি, খোলা, বাড়ি, যাবতীয় সব কিছু দেখাশোনার ভার বটুককাকুর। তার সাহায্য এবং গরু চড়ানোর জন্য আর একটা ছোট ছেলেকেও কাজে বহাল করা হলো। নাম তার মোহিনী। ভারি সুন্দর গানের গলা। মাঠে গরু চড়াত আর গান করত। দুষ্টও ছিল ভীষণ। ও যেন গোষ্ঠের রাখাল। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গাছের ডাবগুলো চুরি করে খেয়ে সাবাড়। মা খুব আদর করত ওকে।

ভোরবেলা কাজে আসে বটুককাকু। মোহিনী সকালে। ভোরবেলাতেই শুরু বটুককাকুর দিন। কাজের ফাঁকে স্নান, খাওয়া, বিশ্রাম। রাতে খাবার শেষে লম্বা এক ছিলিম তামাক খায় অনেকক্ষণ বসে। তারপর বাড়ি যায় শুতে। প্রতি রাতে ওই সময়ে আমার পড়ার টেবিলের পাশে বসে হুঁকোয় তামাক খাওয়া তাঁর ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। বড..ড়ু..ড়ু..ড়ু , বড..ড়ু..ড়ু..ড়ু আওয়াজ উঠত জলে। চোখ বুঁজে আয়েশ করে যখন হুঁকোয় টান দিত, মনে হতো কী এক একাগ্র ধ্যানে যেন নিমগ্ন সে। মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ত। হুঁকোয় টান দিলে কল্কের ভেতরের তামাক অগ্নিগিরির লাভার মতো টকটকে লাল হয়ে জ্বলে উঠত। আবার কালো হয়ে যেত। আবার লাল। দেখতে চমৎকার। ধোঁয়াটা মাঝে মাঝে সিন্দবাদের ছিপিখোলা কলসি থেকে বেরুনো দৈত্যের মতো আমাকে পেঁচিয়ে ধরত। তামাকের গন্ধটাও আমার বেশ লাগত। আমারও খুব ইচ্ছে জাগত তামাক খেতে।

বাবার একটা বই পুরানো আমলের। সাহিত্য-সঙ্কলন। পোকায় কাটা। ভাঙা স্যুটকেসের মধ্যে পেয়েছিলাম। সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু গল্প, কবিতা ছিল বইটিতে। স্কুলের পাঠ্য ছিল এক সময়। মাঝে মাঝে বইটা পড়ি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা পড়ছিলাম সেদিন। 'দুই বিঘা জমি'। নিঃশব্দে। শব্দ করে পড়া আমার অভ্যেস ছিল না। বটুককাকু বলল–

– কী পড়তেছো মশাই?

আদর করে আমাকে মশাই বলত।

– একটা কবিতা।

– শব্দ কইরগা পড়ো দেহি, এট্টু হুনি।
আমি শব্দ করে সেই দীর্ঘ কবিতাটা আগাগোড়া পুরোটা পড়ে যাই। আর বটুক কাকু মাথা নিচু করে বড..ডু..ডু..ডু , বড..ডু..ডু..ডু করে ছিলিম টানতে থাকে। কবিতাটা পড়া শেষ করে বললাম– 'শেষ'।
এরপর বটুক কাকুর দুই চোখে দুই জলের ধারা প্রতি রাতের সাথি হয়ে থাকল। রাতের খাবার পর আমি পড়ার টেবিলে বসলেই বটুককাকু হুঁকোয় তামাক ভরে টানতে টানতে এসে আমার পাশে ছোট্ট একটা জলচৌকিতে বসেই কবিতাটা পড়ার ফরমায়েস করত। কাকু ছিলিম টানত, আমি পড়তাম। এক সময় শেষ হত পড়া। তাকিয়ে দেখতাম– তার দু'চোখে জলের দু'টো ধারা। রোজ খাবার পর এটা হয়ে উঠল আমাদের দুজনের নৈমিত্তিক বিষয়। এটা যেন কবিতা কবিতা এক খেলা।
আমি বুঝতাম বটুককাকুর কষ্ট। আমি জানতাম তার কান্নার রহস্য। বুক জুড়ে হারানো ঐতিহ্যের এক স্মৃতি বয়ে বেড়াত বটুক কাকু। কবিতা শুনে সাময়িক বিচরণ করত সেই স্মৃতিতে। প্রতি রাতেই পড়তে পড়তে আমারও কবিতাটা মুখস্থ হয়ে গেল। যতদিন কবিতাটা পড়েছি, ততদিন কাকু একবার করে কেঁদেছে। তারপর আস্তে করে উঠে, হুকোটা রেখে, নিঃশব্দে, ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। নিজের বাড়ির দিকে।

তিন

এরপর স্কুল পাল্টালাম। হোস্টেলে চলে গেলাম। শহরে। সেই থেকে শুরু হয়ে গেল নাগরিক জীবন। আর ফিরে তাকানো হয় নি গ্রামের দিকে। বটুককাকুরাও দেশ ছাড়ল। স্মৃতিতে ধুলো জমতে শুরু করল ধীরে ধীরে। হরপ্পা সভ্যতার মতো বটুক ও বটুকের কাহিনি চাপা পড়ে গেল স্মৃতির ধুলোর নিচে।
লেনিন হয়ে উঠল প্রিয় মানুষ। মার্কস হয়ে উঠল আদর্শ। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লাম রাজনীতিতে। মিছিল-মিটিং করে কেটে যেতে লাগল সময়। চোখের সামনে তখন এক দর্শন– পৃথিবীতে দু'টো জাত। শোষক আর শোষিত। শ্রেণিসংগ্রাম তাই চিরকালের। আমি শোষিতের পক্ষের। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম– চাকুরি নয়। রাজনীতিই হবে আমার একমাত্র কাজ। পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে গরিবের জন্য, ভূমিহীনদের পক্ষে লড়ব। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করব।
অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। রাজনৈতিক খোলা হাওয়া এসে ভেঙে চুরমার করে দিল আমাদের বিপ্লবের বাগান। হয়ে উঠল না বিপ্লবী হওয়া। পড়া শেষ করে বাঁচার তাগিদে তাই চাকুরির সন্ধান। চাকুরিও জুটল। এক নামকরা এনজিও'র বড় অফিসার। এদের কাজ প্রধানত গ্রাম কেন্দ্রিক। সেই সুবাদে মাঝে সাজে গ্রামে গ্রামে ঘোরা। কোন ফাঁকে যেন ছেলেবেলা এসে ঢুকে পড়ল এই পরিণত যৌবনে। মায়ের প্রতি সন্তানের যেমন টান অনুভূত হয়, তেমনি এক টান অনুভূত হতে লাগল গ্রামের প্রতি।
বহুকাল পর গ্রামে ফিরলাম। সেই শ্রী নেই গ্রামের। তবু ভালো লাগল। ঘর নেই, শুধু জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে পৈতৃক ভিটাটা। গ্রামে যাই, দু'একদিন থাকি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি। চলে আসি। কিন্তু শহরে এসে আর স্বস্তি পাই না। গ্রাম আমাকে টানে। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা বারবার আমার মনে দোলা দেয়– 'ফিরে চল মাটির টানে, যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।'
মনে হলো গ্রামই তো আমাদের প্রাণের উৎস, সম্পদের উৎস। মাথায় এক বুদ্ধি এল। পড়ে থাকা জায়গাটার কিছু অংশ নিয়ে একটা পুকুর কাটব মাছ চাষ করার জন্য, বাকিটুকুতে করব বিশাল বাগান। প্রচুর গাছ লাগাব। যে অংশে বাগান পড়বে তার এক কোণায় বটুক কাকুর চারকাঠা জমি। ছোট্ট একটা ভিটে। খড়ের চালের একখানা ঘর। পাশেই রান্নার জন্য একচালা ছাপরা। বাগানের একপাশে পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে বটুককাকুর বাড়ি। ওটা না হলে বাগানটা জুতসই হয় না। এতদিন পরিত্যক্তই ছিল। বহু বছর পর দেশে ফিরে আবার বটুককাকু ঘর বেঁধেছে। সেখানেই।
পৌষ-সংক্রান্তি। এ সময় গ্রামে মেলা বসে। প্রতি বছরই কবিগানের আসর বসে রাতভর। বিকেল থেকে ভোর রাত অব্দি চলে কবির লড়াই। গ্রামে পৌঁছুলাম তখন বিকেল। সেই ছেলেবেলার বিকেল। সেই সর্ষে ফুলের ভিতর দিয়ে, মটরশুঁটির ভেতর দিয়ে যে সরু হাঁটা পথ, সেই পথ দিয়ে একে একে ছেলেবেলা এসে অধিকার করে নিল আমাকে। আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল। মনে পড়ে গেল জসীম উদ্দিনের নিমন্ত্রণ কবিতার

সেই পঙ্‌ক্তি দু'টো– 'গাছের ছায়ায় লতায় পাতায়, মোর শিশুকাল লুকায়েছে হায়, আজিকে সে সব সরায়ে সরায়ে খুঁজিয়া লইব তায়।' আমি যেন বৈকুণ্ঠপুরের পথের সেই ছোট্ট কিশোর হয়ে গেলাম, যে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে তার বাতাসে সীসাভরা নাগরিক জীবন।

চার

রাতে খাওয়া শেষে বটুককাকুর জন্য আনা উলের সোয়েটার এবং কাকিমার জন্য আনা শাড়িটা নিয়ে বেরুলাম বটুককাকুর বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেই ছেলেবেলায় যখন খাওয়া শেষে পড়তে বসতাম, তেমন সময়ে। সেই ছেলেবেলার অন্ধকার। সেই একই পথে হেঁটে যাওয়া। সেই কুমড়ো ক্ষেতের পাশ। যেতে যেতে মনে পড়ল কুমড়ো চুরির কথা। বটুককাকুর কাজে বহালের কথা। কত কথা! পরিত্যক্ত দালানে দীর্ঘকাল পরে কেউ ফিরে এলে সাড়া পেয়ে হঠাৎ যেমন চামচিকেরা দ্রুত ওড়াউড়ি শুরু করে দেয়, তেমনি মনের পরিত্যক্ত কোঠার স্মৃতিরা সব ছটফট করে উঠতে লাগল। কত যে সব কথা। সেই তামাক খাবার কথা। কবিতার কথা। দুই বিঘা জমির কথা।

বটুককাকুর ঘরের কাছে যেতেই পা দু'টো ভারি পাথর। নিথর। নিশ্চল। থেমে গেল চলা। মগজের মধ্যে চামচিকের মতো পাখা ঝাপটে উঠল 'দুই বিঘা জমি।' আজ আমি সেই উদ্ধত জমিদারের মতো বটুককাকুর কাছে এসছি তার চারকাঠা জমি চাইতে। আমিও বাগান করব। বটুকের সম্বলমাত্র ওইটুকুই জমি।

কার্ল মার্কস এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। লেনিন ধিক্কার জানাল আমার শ্রেণিসংগ্রামকে। প্রগতিশীল বিপ্লবী মনটা মাথাচারা দিয়ে উঠল। বটুককাকুর কাছে জমিটা চাওয়া আমার কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রয়োজন নেই আমার বাগানের। দরকার নেই আমার চারকাঠা জমির। ছাব্বিশ বছর পর আবার 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটা আবৃত্তি করতে পারব না আমি। পারব না বটুককাকুর চোখে আবার জলের দু'টো ধারা দেখতে। আজ আর মুখস্থও নেই কবিতাটা। পা দু'টো অবশ হয়ে গেল। আমি থমকে গেলাম।

পায়ের শব্দে ঘর থেকে মেঘমন্দ্র আওয়াজ উঠলো– কে?

আমার ফিরে আসা হলো না। বললাম–

– আমি।

– ও, বাবুমশাই; ভিতরে আইসো।

এত বছর পরে 'মশাই' এর আগে 'বাবু' যোগ করে দিয়েছে বটুককাকু।

– ভালো আছো, বাবুমশাই?

উত্তর পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম–

– কত বছর পরে দেখা হলো, বলোতো?

– 'ছাব্বিশ বছর'।

উত্তর এল। আগে থেকেই যেন হিসেব কষে রেখেছে জীবনের সব লেনদেন। ধীরে বারান্দায় এসে বসলাম একটা জলচৌকিতে। জিজ্ঞেস করলাম–

– কাকিমা কোথায়?

– ওপারে।

– মানে? ভারতে?

– বলতেও পারো; না-ও বলতে পারো। পরপারে। কিছুক্ষণ নীরবতা। ঠিক শোক নয়। শোকের মতো এক ধরনের আচ্ছন্নতা। নীরবতা পাথরের মতো ভারি হয়ে সময়টাকে নিশ্চল করে দিল। মাটির পিদিমে টিম টিম করে জ্বলছিল কেরোসিন শিখা। পায়ের কাছ দিয়ে দৌড়ে গেল একটা ছুঁচো। দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা ঘুমভাঙা দাঁড়কাক। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল–

– কী ভাবে?

– রেললাইনের পাশে বস্তিতে থাকতাম। একদিন ট্রেনে কাটা পড়ল। তারপর ওখানেরই এক শ্মশানে।

এতক্ষণে খেয়ালই করি নি বটুক কাকুর চেহারা ভালো করে। বিশাল কাঁচা-পাকা চুল; লম্বা দাড়ি। সাদা। ময়লা। চোখ দু'টো যেন দূরের নক্ষত্র। সব মিলিয়ে কেমন সন্ন্যাসীর মতো। যোগীর মতো।

জিজ্ঞেস করলাম– তাহলে রান্না-খাওয়া হয় কী করে?
– আদুরী করে।
এতদিনেও আদুরীর বিয়ে হয় নি ভেবে কষ্ট হলো। চেহারা তো ভালোই ছিল। অভাবের কারণেই কি বিয়ে হয় নি? প্রশ্নটা তুলে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হলো না। এ কথা সে কথার পর সোয়েটারটা বটুককাকুকে দিলাম। শাড়িটার কথা আর বলতে পারলাম না। আদুরী পরতে পারবে ভেবে শাড়িটা চৌকির উপর রেখে একটু পরে উঠে পড়লাম। বটুককাকু বলল–
– বসো বাবুমশাই।
– না। রাত হয়েছে অনেক। এবার যাই।
– কিছু কবা না?
– অনেক কথাই তো বললাম।
– আমি জানি তুমি কী জইন্যে আইস্‌ছো।
– জানো?
– হ। জানি।
– বলো তো?
– না। তুমি কও।
– তুমি তো জানোই। বলো দেখি?
– তোমার মুখে হোনতে চাই।
আমি স্তম্ভিত। বললাম–
– কাকু, তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমাকে আমি কিছু বলতে এসছিলাম। কিন্তু, তার আর প্রয়োজন নেই আমার।
ছলছল চোখে বটুককাকু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পিদিমের টিমটিমে আলোয় বটুককাকুকে মনে হচ্ছিল ছবির মানুষ। সহসা বলে উঠলো–
– আমার একটা কথা রাখবা, বাবুমশাই?
– কী কথা?
– আমার ইচ্ছা, আমার জমিটুকু তুমি নেও।
– সে কী!?
– আমি তো আগেই তোমারে জমি দিয়া রাখছি। যহনই হুনছি তুমি গেরামে আসবা; বাগান করবা; তহনই মনে মনে জমিডা আমি তোমারে দিয়া দিছি।
– এ কী কঠিন শাস্তি দিচ্ছ আমাকে কাকু?
– না বাবা, জমিডা তুমি নিলে, মনে খুব শান্তি পাবো।
– সে আমি পারব না।
– নেবে না তাইলে?
দেখলাম আবার ছলছল করে উঠল বটুককাকুর চোখ। আমি স্থির। আমার বলা 'পারব না' কথাটা পাথরের টুকরোর মতো আমাকেই যেন আঘাত করছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
বটুককাকু বলল– হেই কবিতাডা মনে আছে বাবা? দুই বিঘা জমি? এট্টু হুনাবা?
বললাম– আজ আর তা মুখস্থ নেই।
– আমার আছে। তোমার মুখে হুনতে হুনতে আমার প্রায় মুখস্থ অইয়া গেছিলো। কবিতাডা আমি ভুলি নাই। এ্যাহোনও কিছু কিছু মনে আছে।
বললাম– বাবার সে সাহিত্য-সঙ্কলন বইটা হারিয়ে ফেলেছি। আজ তোমার মুখে শুনব। যেটুকু মনে আছে বল।

এ সময় ঘরের ভেতর থেকে দরোজায় এসে দাঁড়াল সাদা শাড়িতে মোড়া এক ছায়ামূর্তি। বিধবা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কে এ? জলজ্যান্ত এক তরুণীকে সারা জীবনের জন্য কাফনের কাপড় পরিয়ে রেখেছে সমাজ। চেনা-অচেনার সীমানায় এসে দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে এল। শাড়িটা তাহলে . . . ? ভাঁজ না ভাঙা নতুন শাড়িটার দিকে একবার তাকালাম। শাড়িটাকে মনে হলো, দূরের মাঠে কুয়োর পাড়ে পড়ে থাকা মৃত কোনো চামচিকে।

টানাপোড়েন

জানুয়ারির উনিশ। ১৯৯১। রাত সাড়ে এগারো। দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ঘন কুয়াশা। জগন্নাথ হল অক্টোবর স্মৃতিভবনের ৪৩৯ নম্বর রুমে চলছে পড়া। পরীক্ষার প্রস্তুতি। দর্শনের ছাত্র সুজয় আর সংস্কৃতের ছাত্র কেশবের 2^{nd} year final । বাকি দু'জন নির্ঝর আর জয়ন্ত। তাদের পরীক্ষা নেই। বাইরের শীত আর কুয়াশা এড়ানোর জন্য দরোজা-জানালা বন্ধ। এক অস্বাভাবিক খট খট খটাং; খট খট খটাং শব্দে রুমের নৈঃশব্দ মেঝেতে পড়ে যাওয়া ছেলের হাতের গেলাসের মতো টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। হঠাৎ সবাই থ' বনে যায়। হলের কোনো ছেলে কখনও অত জোরে কড়া নাড়ে না। বুক দুরুদুরু করে ওঠে। পুলিশ নয়ত?

সুজয়ের বেডটা দরোজার পাশেই। উঠে যায়। দরোজা খুলে দেয়। ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। ভেতরে ঢোকে সুনীল আর তার বোন বিন্দি। তাদের গ্রামেরই। সুনীল তার সমবয়সী। লেখাপড়া করে নি। হালটি করে। বিন্দি বছর দুয়েকের ছোট। হাই স্কুলে পড়েছে। কিন্তু পাশ দেয় নি। তারও লেখাপড়া হয়ে ওঠে নি। এই স্বল্প শিক্ষিত যুবতীটির বেশ একটু দুর্নামও আছে গ্রামে। এত রাতে হঠাৎ তাদের দেখে চমকেই গেল সুজয়। সুনীলই কথা বলল– বিন্দির অসুখ। কোনো ডাক্তার কবরেজে কাজ অইলো না। হগলেই কইলো, ঢাকা নিয়া যাও। এসে যখন পড়েইছে, এই রাতে তো একটা ব্যবস্থা করতে হয় সুজয়ের। ডাইনিং বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হিটারে আলুসেদ্ধ আর ভাত রান্না করে খাইয়ে সুজয় বিন্দিকে নিয়ে চলল দারোয়ান নৃপেনদার বাসায়। রাতটা অন্ততঃ ওখানে শুয়ে থাক। সকালে ঢাকা মেডিকেলে পাঠাবে। ছেলেদের হলে তো আর মেয়েদের রাখা ঠিক হবে না? নানা কথা উঠবে।

দক্ষিণ বাড়ির পেছনে, পশ্চিম পাশে নৃপেনদার বাসা। পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে হেঁটে এসে দু'জন পৌঁছল নৃপেনদার বাসায়। ততক্ষণে দরোজা বন্ধ। আলো নেভানো। 'কী দরকার এত রাইতে পরের বাসায় থাকার, তোমার রুমে চলো, আমি নিচে সুয়ে থাকবানি' –বলে বিন্দি বন্ধ ঘরের দরোজার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুজয়ের হাত ধরল। বিন্দির ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি হলো। এই শীতেও সুজয়ের কান গরম হয়ে উঠল। হাতটা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে দরোজায় ধাক্কা দিল। রুমে ফিরে এসে দেখে সুনীল তার বিছানায় পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। মগজের মধ্যে রক্তের দাপাদাপি। এই শীতেও সে ঘামছে। কাল সকাল ১০টায় পরীক্ষা। রাত এখন ১টা। পড়ায় মন নেই। Mood টাই নষ্ট হয়ে গেছে। যত্তোসব উটকো ঝামেলা।

পরদিন পরীক্ষা শেষ করে রুমে ফিরে দেখে সুনীল বসে বসে বিড়ি টানছে। বিন্দিকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে দিয়ে এসছে। কী কী নানা সব পরীক্ষা করবে ডাক্তাররা। তারপর ওখানেই চিকিৎসা চলবে। কিছু বলে নি কতদিন লাগবে। সুনীল জানালো– সে সুজয়ের এখানেই থাকবে। হলে খাবে। রাতে ঘুমুবে। আর মাঝে মাঝে বিন্দিকে দেখে আসবে। কিছু লাগলে কিনে দেবে।

রুমের কেউই বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। সুজয়ও না। তবুও চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কেউ কিছু বলল না মুখ ফুটে। অবশ্য আচরণে প্রকাশ পেল বিরূপ মনোভাব। লোকটা যেন ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠল সবার কাছেই। দু'দিন যেতে না যেতেই একটা মাদুর আর বিছানা বালিশ দিয়ে তাকে বলা হলো মেঝেতে আলাদা শুতে। মৃতের মতো ঘুমায়। সারারাত নাক ডাকে, যেন রাতের নদীতে মাছ ধরা চলন্ত ট্রলার। কারও ঘুমও হয় না। পড়াও হয় না। লোকটাকে অপছন্দ হওয়াতে তার বোনটাকেও কেউ দেখতে যায় না হাসপাতালে। কী অসুখ, কী অবস্থা, কীভাবে থাকছে– তার কোনো খোঁজ নেয় না কেউ। কেমন আছে, অবস্থার উন্নতি না অবনতি– তাও জানতে চায় না কেউ। সুনীলও কাউকে কিছু বলে না আগ বাড়িয়ে। কোথায় একটা অসহনীয় দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় এই অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথিটির সাথে।

লোকটা খায় দায়, ঘুমায়। ঘুরে বেড়ায়। টিভি দেখে। সারাদিন টো টো করে। দু'একদিন সিনেমাও দেখে আসে বলাকায়। যেন ঢাকা আসছে ফুর্তি করতে। ওদিকে বোন হাসপাতালের বেডে। সিনেমা দেখে এসে কোনো কোনো দিন সিনেমার গল্প জুড়ে দেয়। রুমের সবাই বিরক্ত হয়। সেদিকে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই সুনীলের। বাবা মারা গেছে বেশ কয়েক বছর আগে। বিধবা মা একা বাড়িতে। তাকেও খবর দেয়ার কোনো নাম গন্ধ নেই। হয়ে গেলো প্রায় দশ-বারো দিন। যাবারও কোনো তাড়া বা সাড়া কোনোটাই দেখা যায় না।

এক সন্ধ্যায় সুনীল মলিন মুখে এসে জানালো– বিন্দির অবস্থা খুব খারাপ। ব্যস, এটুকুই। কেমন খারাপ– তা শুনতেও কেউ আগ্রহ দেখায় না। পরদিন সকালে সুনীল বেরুল। সারাদিন আর ফিরল না। রাত ১০টায় ফিরল। মুখ ভার। বিপদ সঙ্কেত। বোঝা গেল, কোন দুঃসংবাদ।

– কীরে সুনীল, কোনো খারাপ খবর? বিন্দি কেমন? –সুজয় জিজ্ঞেস করল।

হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠল সুনীল–

– বিন্দি কি আর আছে? আমারে ফাঁকি দিয়া চইল্যা গেছে।

– বলিস কী, বিন্দি মারা গেছে? কখন?

– গেল রাইতে, ভোরবেলা। সকালে হাসপাতালে যাইয়া দেহি, বিন্দি সাদা কাপুড়ে ঢাকা।

কী বলবে, ভেবে পায় না সুজয়। এমনটা হবে, তা ভাবতেও পারে নি সে। সুনীলের জন্য কষ্ট হয়, আবার রাগও হয়। মনে পড়ল– গত পরশু রাতেও সুনীল বলাকায় গেছিল সিনেমা দেখতে। রাগ হলো সুনীলের উপর। ভেতরে ভেতরে বিন্দির এত মারাত্মক অসুখ, তা কখনও টের পায় নি ওরা, ভাবতেও পারে নি। সুনীলও কিছু বলে নি। 'শালা সিনেমা দেখে বেড়িয়েছে' –রাগে পাছায় লাথি মেরে রুম থেকে বের করে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারে না। শত হলেও তার বোন মারা গেছে। শোকটা কম নয়। কিন্তু যার বোন হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যু নিয়ে শুয়ে ছিল, সে কী করে সিনেমা দেখে বেড়ায়? সুজয়ের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম হলো। এখন তো আর বসে থাকা যায় না তাহলে। লাশের একটা সদ্‌গতি করা তো দরকার? হাসপাতাল থেকে বের করা, কফিন কেনা, ট্রাক ভাড়া করা; তারপরে বাড়ি পাঠানো। ঝক্কি কম না। টাকারও তো দরকার প্রচুর। লাশের সাথে শুধু সুনীলকে একা পাঠানো যায় না। সাথে অন্য কারো থাকা দরকার। তার চলছে পরীক্ষা। কোনোমতেই যাওয়া সম্ভব নয়। কাকে পাঠায়, কী করে? বুঝে উঠতে পারছে না কিছুই। বলল– মারা গেছে ভোর রাতে, তুই ফিরলি এখন। সারা দিন কোথায় ছিলি, কী করেছিস্?

সুনীলের প্রতি সুজয়ের বেশ একটু করুণা হচ্ছে। বেচারা। বোনটা চিকিৎসা করতে এনে হারিয়ে গেল। সুজয়ের একটু লজ্জাও হলো। নিজকে অপরাধী লাগছে। ছেলেটার সাথে খারাপ আচরণ করেছে। থাক পরীক্ষা, তাই বলে মেয়েটার একটু খোঁজও নেবে না? মানুষ, এমন নিষ্ঠুর কী করে হয়? শত হলেও তার গ্রামেরই মেয়ে? বিন্দির খবরাখবর সুজয় একবারও নেয় নি। ভাইটার উপর রাগ করে বোনটার কথাও জিজ্ঞেস করে নি একবারও। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। তাছাড়া সুনীলের উপরই বা তার রাগের কারণ কী? সে তো প্রতিদিনই গিয়ে দেখে আসত হাসপাতালে। দু'একদিন বিকেলে সিনেমা দেখতেই পারে। এ আর কী এমন দোষের? এখন মনে হচ্ছে, সুনীল খুব একটা অন্যায় করে নি। বরং সেটাই স্বাভাবিক। শুধু শুধুই তারা তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে। গ্রামে বিন্দির নামে একটু আধটু দুর্নামও আছে। সে কারণেও সুজয় তাকে একটু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। মনে মনে বিন্দির প্রতি ঘৃণা পোষণও যে না করেছিল, তা নয়। এ সব থেকে তার অপরাধ বোধ হতে লাগল। মনে হচ্ছে, সে খুব অন্যায় করে ফেলেছে। সুনীল জানাল, লাশের একটা সুরাহা করতে সারাদিন সে হাসপাতালেই ছিল।

– পারলি কিছু করতে?

– হ, পারছি।

– কী করেছিস?

– বেইচ্যা দিয়া আইস্‌ছি।

কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সুজয়। মনে হলো ভুল শুনছে। শব্দটা তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিল। কোনো শব্দ নয়, মনে হলো একটা উত্তপ্ত লৌহশলাকা ঢুকে গেল কানের ভেতর। কানের পর্দা ছিঁড়ে মাথার মগজের মধ্যে তুলল দুরন্ত তোলপাড়।

– কী বললি?

– হ, বেইচ্যা দিছি। কী আর করবো? ১৬০০ টাকায় বেইচ্যা আইস্‌ছি।

ছাদ থেকে হঠাৎ যদি বিশাল একটা জ্যান্ত ডাইনোসরও পড়ত রুমের মধ্যে, এতটা বিস্মিত হতো না সুজয়। বলে কি না তার বোনের লাশটা হাসপাতালে বিক্রি করে দিয়ে আসছে? সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল সুজয়ের। ময়রার দোকানে কড়াইয়ে ফুটন্ত তেলের মতো তার মগজের মধ্যে ভীষণ আলোড়ন। এও কি সম্ভব?

কত বড় পাষণ্ড হলে যুবতী বোনের লাশটা বিক্রি করে দিতে পারে? মাত্র ১৬০০ টাকার লোভে যে এত হীন কাজ করতে পারে, সে পশুর চেয়েও অধম। পিশাচ। এতক্ষণে যে একটু করুণা জেগেছিল, তা মুহূর্তে উধাও। বোমার মতো বিস্ফোরিত হলো রাগ। এ মুহূর্তেই একে রুম থেকে তাড়িয়ে দেয়া দরকার। ও তো সাক্ষাৎ পশু। রুমে সবাই ছিল। এ কথা শুনে সবাই পাথরের মূর্তি হলে গেল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই নির্বাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই ভয়াবহ স্তব্ধতার মধ্যে এক অশরীরী আত্মার হিস্ হিস্ শব্দ। লোকটা যেন জীবন্ত এক প্রেতাত্মা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সবার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কেশবের মনে হলো পথের কুকুরের মতো লোকটাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয়া উচিত। বলল– সুজয়, হারামজাদাকে বের করে দাও।

– এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাবি। আজ আর এখানে তোর জায়গা হবে না। তোর মতো পিশাচকে থাকতে দিয়ে আমি ভুল করেছিলাম।

– এই রাইতে তাইলে আমি কই যাবো? আইজকার রাইতটা এট্টু থাকতে দে, কাইল সকালে চইল্যা যাবো।

– যে নিজের বোনের লাশ বিক্রি করে দিতে পারে; তাকে আমি থাকতে জায়গা দেব না।

– বিশ্বাস কর সুজয়, না বেইচ্যা আমার কোনো উপায় ছিল না।

– তার মানে? কী এমন ঘটেছিল তোমার?

চোখের জল মুছতে মুছতে সুনীল বলে– হাসপাতালে যাইয়া দেহি সাদা কাপুড়ে বিন্দি ঢাকা। নার্স কইলো, গত রাইতে ভোরে মারা গেছে। লাশ নিয়া যান। ডাক্তারের কাছে গেলাম, কী কী চার্জ নাকি লাগবে কইলো। ম্যালা টাকার দরকার। আমার কাছে তো টাকা নাই।

সুজয় ক্ষেপে ওঠে– সিনেমা দেখে শেষ করেছো, তাই না? লাশ ছাড়ানোর টাকা নাই, সিনেমা দেখার টাকা থাকে। আমাদের বলেছিস্ টাকার কথা? লাশ বিক্রি করে আসছে। তোর নাকি কান্না শুনতে চাই না। শীঘ্র বিদেয় হ।

– বিশ্বাস কর সুজয়, আমার কোনো দোষ না, কোনো উপায় ছিল না।

– কেন , কী হয়েছিল যে তোমার কোনো উপায় ছিল না?

– একটা কিছু কী করা যায় হেইজন্যে তোগো কাছে আইসতে চাইছিলাম। আয়া ধরলো। তারে নাকি বকশিস্ দিতে অবে। নিয়ম নাকি? ডোমের সাথে দ্যাহা। কইলো হেয়াগোও নাকি কী ফি দিতে অবে? লাশ নেওয়ার জইন্যে বাক্স কিনতে অবে। এ্যাতো টাকা কোহানে পাবো। তারপর লাশ গেরামের বাড়ি নিতে ট্রাক লাগবে। ডোমরা কইলো– ট্রাক ভাড়াই নাকি লাগবে চাইর-পাঁচ আজার টাকা। হুইন্যা আমার তো মাথার ঠিক নাই। কী করি? এ্যাট্টা লাশ হাসপাতাল থেইক্যা নিতে এ্যাতো ভেজাল, এ্যাতো টাকা। একটা ডোম কইলো–

– লাশটা বেইচবি? ম্যালা টাকা পাবি?

হুইন্যা মাথায় রক্ত উইঠ্যা গেল। কইলাম–

– ক্যামোন্ কথা কও তোমরা, লাশ বেচবো?

একজন কইলো– এক আজার টাকা পাবি, চিন্তা কইর‍্যা দ্যাখ।

আমি কইলাম– আমার বুইনের লাশ আমি ব্যাচবো না।

– তাইলে সব ফি দিয়া লাশ নিয়া যা? চাইর-পাঁচ আজার টাকা ট্রাক ভাড়া দিয়া লাশ বাড়ি নিয়া সাজাইয়া রাখ? বলদ কোথাকার?

– তাই বলে লাশ ব্যাচবো?

– ছাক্কা দেড় আজার টাকা পাবি। কোনো ফিও লাগবে না। ট্রাক ভাড়াও লাগবে না। নাচতে নাচতে বাড়ি যাইয়া আরাম কইর‍্যা খাবি। দিবি লাশ?

– না ।

তারা আমারে নানা দিক বুজাইয়া কইলো। দলের সর্দার কইলো–

– বোকামি না কইর‍্যা লাশ বেইচ্যা দিয়া যা, দ্যাশের কামে লাগুক। এ্যাত্তোগুলা টাকা খরচ কইর‍্যা নিয়া, বাড়ি যাইয়া পোড়াইয়া ফ্যালাইবি, তাতে কী অইবো? নে, আরও একশো টাকা দিতেছি। ১৬০০ টাকাই তোর লাশের দাম। পুরা টাকাডাই তোর লাভ। খরচ তো লাগবেই না, ফাও ১৬০০ টাকা। রাজি?

– হগল দিক চিন্তা কইর‍্যা দেখলাম বেইচ্যা দেওয়াই ভালো। তাই ব্যাচলাম। কও, এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল?
– লাশ ফেলে তাহলে এমনিই চলে আসতি? তাই বলে বিক্রি করে আসবি? বিবেকে তোর একটুও বাঁধলো না? একটু বুকও কাঁপলো না? টাকাটা নিতে হাতটাও একটু কাঁপলো না তোর?
– টাকা নিতে আমার কি কষ্ট লাগে নাই? ভাবলাম লাশ তো ফ্যালাইয়া রাইখ্যাই যাইতে অবে। তাইলে আর খালি খালি টাকাটা না নিলে লাভ কী? না নেওয়াই তো লোকসান? তাই নিলাম। মাথায় এ্যাতো কিছু চিন্তা তহোন আইসে নাই। এ্যাহোন কী করি?
– যা, টাকা ফেরৎ দিয়ে আয়। তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।
টাকাটা পকেটে পুরে সুনীল বেরিয়ে যায়। শীত রাতের কুয়াশা চিরে শহিদ মিনারের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় সুনীল। পকেটে বোনের লাশ বিক্রির ১৬০০ টাকা। তার বোনের শরীরের মতোই গরম। একবার ভাবে– ফির‍্যা যাই রুমে। বিন্দিরে বা বিন্দির লাশটা তো আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না? শুধু শুধু টাকাডাই মাডি। থমকে দাঁড়ায়। আবার ভাবে– না, থাউক। বিন্দিই নাই, টাকা দিয়া কী অবে? আবার ভাবে– টাকাই তো হগল। টাকার জন্যেই তো বিন্দি মইর‍্যা গ্যাছে। টাকার জন্যেই তো বিন্দির লাশটা ছাড়াইতে পারি নাই? ১৬০০ টাকা হ্যার কাছে ম্যালা। গরিব মানুষ। একটা কিছু কইর‍্যা খাইতে পারবে। টাকাটা কাজে লাগবে। থেমে যায় সুনীল। ভাবে– রুমে ফির‍্যা গিয়া মিথ্যা বলবে যে, টাকা ফেরৎ দিয়া আসছে। পা চালায় হলের দিকে। হঠাৎ তিন-চার জন লোক ঘিরে দাঁড়ায় তাকে। বুকে ছুরি ঠেকিয়ে বলে– বের কর শালা, কী আছে তোর কাছে?
– জলদি দে, নইলে ঢুকিয়ে দেবো।
– চ্যাঁচাবি না একদম।
– ঝট্‌পট্ কর।
ভয় পেয়ে যায় সুনীল। হতভম্ব। এর আগে কখনও ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়ে নি। কী করবে, বুঝে উঠতে না পেরে যন্ত্রচালিতের মতো হাত ঢুকিয়ে পকেট থেকে বের করে আনে টাকাটা। দিতে যাবে; হঠাৎ তার কী মনে হলো– ভোঁ দৌড়। আকস্মিক এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না লোকগুলো। পেছন থেকে তারাও ধাওয়া করল। সুনীলও তীরবেগে প্রাণপণে ছুটছে। মেডিকেলের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। ছিনতাইকারীরা নাগাল না পেয়ে ফিরে গেল।
ডোমদের বস্তির দিকে রওনা দিল সুনীল। পকেটে লাশ বিক্রির ১৬০০ টাকা। টাকা তো নয় যেন বারুদ। টাকাটাকে তার অভিশপ্ত মনে হলো। মনে হচ্ছে– ও টাকা নয়, বিন্দির হৃৎপিণ্ড। ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্ করছে। বিন্দির প্রেতাত্মা যেন টাকায় ভর করেছে। নির্জন কুয়াশা ভেজা অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে তার ভীষণ ভয় করছে। বিন্দির আত্মা যেন বাতাসে কুয়াশার কণা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হয় পকেটে টাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। লাশ বিক্রির যন্ত্রণাটা বুকে পাথরের মতো চেপে বসেছে। টাকাটা ডোমদের কাছে ফেরৎ দিতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। পাথরটা নেমে যাবে বুক থেকে। ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়ল বস্তির মধ্যে।

ভেতরে আদিম উল্লাস। একদল মানুষ মরা আলোয় বসে তাড়ি গিলছে, ঢুলছে আর অকথ্য খেউর খিস্তি দিয়ে অশ্লীল আনন্দে মেতে রয়েছে। সুনীলের মনে হলো, এরা সভ্য জগতের বাসিন্দা নয়। আদিম মানুষের মতো। ভূতের মতো লাগছে। ওর ভয় হতে লাগল। লক্ষ্য করল, যে ডোমরা লাশ কিনেছে, তাদের মধ্যে দু'একজন রয়েছে সেখানে। ডোম সর্দারকেও সে চিনতে পারল। বলল–
– সর্দার, আমি আমার বুইনের লাশ ব্যাচবো না। টাকা ফেরত ন্যান। এই ন্যান ১৬০০ টাকা।
– ক্যাডা, ও তুই? জানস্ না, ব্যাচা মাল ফেরত অয় না? লাশ তুই পাবি না।
– লাশের কাম নাই আমার। টাকাটা ফেরত ন্যান। এ টাকা আমি নিতে পারবো না। মনডায় কষ্ট লাগছে।
হো হো করে হেসে উঠলো সবাই– শালা ধম্মপুত্তুর যুধিস্টির। মাল ব্যাচ্ছোস, পয়সা নিছোস; হ্যাতে আবার পাপ-পুণ্যি কী রে? টাকা না নিতে চাস্, ফেরত দিয়া যা। আর দুই বোতল মাল টানি।

সুনীলের আবার মতান্তর হয়। ঠিকই তো, টাকাটা ফেরত দিলেই বা কী, না দিলেই বা কী? টাকা তো টাকা। কাগজের নোট। এক হাত থেইক্যা অন্য হাতে যায়। ঘোরে। তাতে তো আর পাপ-পুণ্যি লাগার কথা না? তাছাড়া বিন্দির লাশ তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না? মিছামিছি ভাইব্যা মরছে। ১৬০০ টাকা তার জইন্যে কম না। একটা কিছু কইর‍্যা খাইতে পারবে। আবার ভাবে– এডা সে কী সব ভাবছে। বুইনের লাশ বিক্রির টাকায় প্যাট চালাবে? ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো সে দুলছে। সর্দার বলল–

– কী রে যুধিস্টির, লাশ না ব্যাচলে দান কইর‍্যা যা, লাশ আর ফেরত পাবি না। টাকাটা ফেরত দিয়া যা। ক্ষোভলাল টাকাটা নিয়া নে।

বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত প্রেতমূর্তির মতো সুনীল যখন রুমে ফিরে আসে, রাত তখন প্রায় বারোটা বেজে গেছে। রুমের কেউই ঘুমোয় নি। সবাই জেগে। তাকে দেখেই সুজয় বলল–

– কী রে, এতক্ষণ লাগল? দিয়েছিস্ ফেরত?

সুনীল নিশ্চুপ।

– কী রে, কথা বলছিস্ না?

সুনীল সুজয়ের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

নির্ঝর– টাকা মনে হয় দেয় নি।

জয়ন্ত– ওকে দিয়ে বিশ্বাস নেই।

সুজয়– কথা বলছিস না কেন?

কেশব– আর যাই হোক, এ লোকটাকে রুমে রাখা যাবে না ভাই? তাড়াও শিগগির।

সুনীল– এ্যাতো রাইতে আমি কই যাবো? কোনোমতে আইজকার রাইতটা এট্টু থাকতে দ্যাও। তোমাগো পায়ে পড়ি।

সুজয়– অসম্ভব, তুই এক্ষুণি বেরিয়ে যাবি। আর তোর এখানে জায়গা হবে না।

– আমি পাপ করছি সুজয়, আমারে ক্ষমা কর। আমি সক্কালেই চইল্যা যাবো। আইজকার রাইতটা এট্টু থাকতে দে।

কেশব– থাকলে ওই ব্যালকনিতে থাকতে পারো। তোমার মতো পিশাচকে রুমে রাখতে পারবো না।

জয়ন্ত– ও তো সাক্ষাৎ ভূত। ও রুমে থাকলে, ভয়ে মরেই যাবো।

সুজয়– থাকলে ওই ব্যালকনিতে থাকতে পারিস। রুমে নয়। কোনো বিছানা-পত্তরও পাবি না। বালিশও না।

সুনীল তাতেই রাজি হয়। তাকে ব্যালকনিতে পাঠিয়ে ভেতর থেকে দরোজা বন্ধ করে দিল। ভেতরে থমথমে ভয়ের জমাট বাঁধা নৈঃশব্দে, যার যার বিছানার ওমের মধ্যে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল চারজন শিক্ষিত যুবক। ঘুম এল না কারো চোখেই। কেবল মনে হচ্ছিল রুমের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিন্দির অতৃপ্ত আত্মা। বাইরে পাঁচ তলার ব্যালকনিতে শীত আর কুয়াশার অন্ধকারে সুনীল একাকি শুয়ে। তারও ঘুম নেই চোখে। কেবল মনে হচ্ছে, সে ভীষণ পাপ করেছে। মরে যেতে ইচ্ছে হয়। তারও ভয় করছে। কখনও শব্দ করে চলে যায় টহলদারি পুলিশের জিপ। কখনও রাতের নৈঃশব্দ চিরে চিৎকার করে ওঠে রাস্তার কুকুর। সুনীলের মনে হয়, বিন্দির আত্মা তার চারপাশেই আছে। ভয় ভয় করে। শীতও পড়েছে ভয়ঙ্কর। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের ব্যাগটাকে আর তার জামা কাপড় কোনো রকম গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকে।

না। ঘুম আসছে না কারো। সুজয়ের মনে হচ্ছে, লোকটার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। আবার ভেতরেও রাখতে ইচ্ছে করছে না। কেশবের মনে হচ্ছে, তার চারপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বিন্দির আত্মাটা। সুজয়ের মনে পড়ল, সে রাতের বিন্দির কথা। সুজয়ের হাতটা বিন্দি বেশ জোরে চেপে ধরেছিল। তার একটা আলাদা অর্থ ছিল। কী অর্থ ছিল? বিন্দির জন্য মনটা কেমন করে উঠল। বিন্দি কি তাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল? ভাবতে ভাবতে কেমন একটা তন্দ্রার মতো এসছিল। সবারই চোখের পাতা জিওলের আঠার মতো ঘুমে জড়িয়ে এসছিল। কিন্তু ঘুমুতে পারছিল না। হঠাৎ ব্যালকনির দরোজায় ধাক্কা। ধড়মড় করে উঠে বসে কেশব।

– সুজয়, শীতে মইর‍্যা গেলাম। একখান কাঁথা দিবি সুজয়? সুজয়, একখান কাঁথা দে না? আমার শীত করছে। একলা একলা ভয় করছে।

সুজয়ের ঘুম ভেঙে যায়। উঠে একখানা কাঁথা দেয়। আবার শুয়ে পড়ে। বেশ খানিক পরে আবার দরোজায় ধাক্কা–

– সুজয়, আমি বাঁচবো না। আমারে ভিতারে নে। আমার ভয় করতেছে। সুজয়, আমার খুব ভয় করতেছে।

কেশবের ধমক– তোমাকে যে আমাদের ভয় করে। তুমি তো ভূত। তোমার আবার ভয় কী? থাকো ওখানেই। আমাদের কিছু করার নেই। রাত যত গভীর হয়, শীত তত জমাট হয়। মাকড়সার জালের মতো সুনীলকেও তেমনি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরে ভয়ে। চারপাশে সে বিন্দির অস্তিত্ব টের পায়। চিৎকার দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। শোকে, দুঃখে, অনুশোচনায় তার মরে যেতে ইচ্ছে করে। এক পাপ-বোধ তাকে ঘুণপোকার মতো কুঁরে কুঁরে খায়। যত ভাবে, ভয়টা তত জেঁকে বসে। নিজকে তার পাষণ্ড মনে হয়। শীত, ভয় আর পাপবোধ তাকে পাগল কওে তোলে। কিছুক্ষণ বাদে আবার দরোজায় দুম্ দুম্ শব্দ– সুজয়, আমার ভীষণ ভয় করতেছে। আমারে ভিতারে নে। ভারি শীত। এহানে থাকলে আমি বাঁচবো না। শুনেও শুনল না কেউ। যে যার মতো শুয়ে থাকল। ক্লান্তি আর অবসাদে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

দুঃস্বপ্ন দেখে কেশবের ঘুম ভেঙে গেল ভোরের দিকে। বাথরুমে গেল। ফিরে এসে জল খেলো। তারপর বিছানায় শুতে যাবে, তখন মনে হলো– লোকটা কী করছে, একটু দেখি। ছিটকিনি খুলে দরোজা সামান্য একটু ফাঁক করে লোকটাকে দেখতে পায় না। কী ব্যাপার? আর একটু খুলে পুরো ব্যালকনিটা দেখে চমকে ওঠে কেশব। নেই। সে নেই। কোথাও নেই। পাঁচ তলার ব্যালকনি থেকে হাওয়া। নিশ্চয়ই ভূত। চিৎকার দিয়ে ওঠে কেশব। রুমের সবার ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড় জেগে ওঠে সবাই। কেশব কাঁপছে। ভয়ে। ছুটে আসে সুজয়। কোথাও দেখে না সুনীলকে। তাহলে? রুমের দরোজা তো বন্ধ ছিল। রীতিমত ভৌতিক ব্যাপার। রুমের সব কটা বাতি জ্বালানো হলো। দরোজা বন্ধ থাকায় রুমের মধ্যে সুনীলের আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবুও, সন্দেহ দূর করার জন্য সব চৌকির নিচে, আলনার পেছনে, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। নেই। সে নেই। তাজ্জব ব্যাপার। আস্ত একটা মানুষ হাওয়া। ভয়ে সবার জিভ শুকিয়ে কাঠ। বুক দুরুদুরু। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ব্যালকনিতে ছুটে যায় সুজয়।

অন্ধকার তখনও কাটে নি। বাইরে কুয়াশা গাঢ়। প্রচণ্ড শীত। রাত পোহাবার তখনও অনেক বাকি। একটা কাকও ডাকে নি তখনও গাছের ডালে। রাস্তার নিয়ন আলোর বাতি কুয়াশায় ভিজে বুড়ো মানুষের চোখের মতো মিট মিট জ্বলছে। আলোটাও যেন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মুহূর্তে ব্যালকনিতে ঝুঁকে দাঁড়ায় সুজয়। নিচে তাকায়। রাস্তার ওপাশের ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন বাতির পাণ্ডুর আলোর একফালি, দেয়াল টপকে এ পাশে এসে পড়েছে, বিল্ডিং এর পেছনের দিকটায়। ব্যালকনির নিচে। ড্রেনের উপর। আড়াআড়ি পড়ে আছে একফালি ভয়ে পাণ্ডুর, হিম শীতল মরা আলো। ফ্যাকাসে। বিবর্ণ। এক টুকরো অসহায় আলোর লাশ। বাকি চারপাশ অন্ধকার। গাঢ় কুয়াশার মায়াজাল।

ব্যালকনির একপাশে চোখ যেতে দেখা গেল– পুঁটলির মতো সুনীলের ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের ব্যাগ। ছড়ানো ছিটানো জামা-কাপড়। পরিত্যক্ত কাঁথা। চারপাশে পড়ে আছে সস্তা আয়না, চিরুনি, বিন্দির লিপিস্টিক। পাশেই এক তোড়া টাকা। অবাক হয় সুজয়। মনে হলো– ও টাকা নয়, বিন্দির শরীর।

নিলামবালা

এক

মাথার ওপর গনগনে চুল্লি। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। হনহন সবুজ। ছুটছে। গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আশরাফুল আলম সবুজের। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না– কান্না না ঘামের জল। কপালে, চিবুকে, চোখের নিচে জলের ধারা। যা গরম পড়েছে, ঘামের জল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হবে সে কাঁদছে। যে কেউ দেখেই তাই মনে করবে। কিন্তু রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে কি কেউ কাঁদে? হতে পারে ক্লান্তি আর অবসন্নতায় ঘামের জলটাকেই চোখের জল বলে মনে হচ্ছে। আবার দু'টোই লোনা জলের ধারা। জ্যৈষ্ঠের পিচঢালা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পুরো ভিজে গেছে সবুজ। মনে হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। কারণ, প্যান্ট শুকনো, জামাটা ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। অনেক দিনের পুরনো। পাৎলা হয়ে গেছে। ভেতরের গেঞ্জিটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। বাইরে থেকে দেখা যায়। জামাটা শুকনো থাকলে অবশ্য ছেঁড়াগুলো বোঝা যায় না। একটাই জামা, একটাই প্যান্ট। নোংরা হলে রাতে কেচে দেয়। সকালে শুকিয়ে যায়। তারপর ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দেয় কিছুক্ষণ। ইস্ত্রি করা শার্টের মতো ভাঁজ হয়ে যায়। আলাদা করে ইস্ত্রি করা লাগে না। তবে যেদিন ইন্টারভিউ থাকে, সেদিন গলির মোড়ের 'পরিপাটি ধোলাই' লন্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনে। সেখানেও খরচ বেড়েছে। আগে একটা শার্ট বা প্যান্ট দেড় টাকা নিত। এখন দু'টাকা করেছে। আবশ্য ইস্ত্রি করলেও তার দু'টাকাই জলে যায়।

সে তো ফুলবাবু হয়ে রিক্সা কিংবা গাড়িতে ইন্টারভিউ দিতে যায় না। এমন কি বাসেও না। হেঁটে হেঁটেই যায়। কতইবা বড় ঢাকা শহর? তিন-চার ঘণ্টায় এ-মাথা থেকে ও-মাথা হেঁটে যাওয়া যায়। তাছাড়া হাঁটলে ব্যায়ামও হয়, শরীর মজবুত থাকে। পয়সাও বাঁচে। আর ইন্টারভিউ দিতে বেশিদূর হাঁটাও লাগে না। সে থাকে লালবাগের ওদিকটায়। জগন্নাথ সাহা রোড। গুলশান, বনানী অবশ্য এড়িয়ে যায় সবুজ। কারণ, তার মনে হয় ওসব জায়গায় তার চাকরি হবে না। তার থাকার জায়গা থেকে ইন্টারভিউ দিতে যেতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগে নি তার কোনোদিন। কী আর এমন পথ? গ্রামে থাকতে এর চেয়ে বেশি হাঁটতে হতো প্রতিদিন। তাই সে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে জামাটা ভিজে যায়। হয় বৃষ্টিতে, নয় রোদে ঘেমে। ভিজবেই। শীতকালে ভেজার সমস্যাটা কম। নইলে তার জামা প্রায়ই ভেজা থাকে। তাই ইস্ত্রি করলে দু'টো টাকাই জলে যায়। জলে যায় মানে ঘামের জলে যায়। কতবার ভেবেছে আগামী মাসে একটা জামা কিনেই ফেলবে। শহরের ফুটপাতে কত জামা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ বেচাকেনা দেখেছে। ৮০/৯০ টাকায় জামা হয়ে যায়। ১০০ বা ১১০/১২০ টাকায় বেশ শক্ত, মোটা আর মজবুত জামা পাওয়া যায়। একটা কিনবে আগামী মাসে অবশ্যই। সে মাসেও কোনো একটা ফ্যাকড়া বাধেই। হয় চাকরির দরখাস্ত, নয় বাড়ি থেকে বোনের চিঠি– 'মায়ের ওষুধ লাগবে। কাশিটা বাড়ছে' কিংবা 'স্কুলের বেতন বাকি পড়েছে, জামা ছিঁড়ে গেছে' আরও কত কী! চাকরির দরখাস্ত মানে ১০০ টাকার ব্যঙ্ক ড্রাফট বা পে-অর্ডার। তা-ও যদি একটা চাকরি হতো। চাকরি দেয়ার নামে ব্যাটারা ব্যবসা ফেঁদেছে। প্রতি মাসেই দু'একটা ইন্টারভিউ থাকে। আর বেরিয়ে যায় দু'একশো টাকা। জামাটা আর কেনা হয় না।

জ্যৈষ্ঠের পিচঢালা রাস্তায় চলছে সবুজ। রাস্তার পিচ গলে গলে চটির তলিতে আটকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সামনের রাস্তা তাকে এগুতে দিচ্ছে না। এক সময় সে আবিষ্কার করে, তার চটির তলি নয়; পায়ের নিচে সুড়সুড়ি দিচ্ছে রাস্তার গলিত পিচ। পা-টা তুলে এক ফাঁকে দেখে নেয়; তার পায়ের নিচে সাদা অংশে কালো পিচের ছোপ। বাটিকের কাজ করা পাঞ্জাবির মতো। তাকিয়ে দেখে চটির ডান পাটির তলি ক্ষয়ে পোড়া তন্দুরি রুটির মতো ফাঁকা হয়ে গেছে। চটির ক্ষয়ে যাওয়া ফাঁকা দিয়ে রাস্তার কালো পিচ দেখা যায়। আবার মুচিকে বাইশ টাকা দিতে হবে। চটিটা যে কত আগের কেনা, তা মনে করতে পারে না সবুজ। মনে হয় বরফ যুগে ডাইনোসরের বিলুপ্তির সময় কেনা। কতবার যে তলি পাল্টিয়েছে, তার ঠিক নেই। উপরের অংশও কয়েকবার পাল্টিয়েছে। তবে খুব বেশি নয়। দুই কি তিনবার। অবশ্য মূল চটির আর কিছুই বিদ্যমান নেই এখন।

পাল্টাতে পাল্টাতে এ জোড়া অন্য চটি হয়ে গেছে। আসল চটিজোড়ার রঙটা কী ছিল মনে করতে পারে না সবুজ। ডিজাইনটাও মনে নেই। চাকরি পেলে একজোড়া নতুন চটি সে কিনবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়। চাকরিটা হয়ে যেতে পারে। লিখিত পরীক্ষায় ভালোই করেছে। ভাইভাতেও মোটামুটি ভালোই উত্তর দিয়েছে। নামি কোম্পানি। হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আজকে রেজাল্ট দেয়ার কথা। বলেছে চিঠি দেবে না। বোর্ডে রেজাল্ট টাঙিয়ে দেবে। সে উদ্দেশ্যেই যাত্রা। শালার মাঝখানে স্যান্ডেল হয়ে গেল পোড়া তন্দুরি রুটি। তন্দুরি রুটির কথা মনে হতেই ক্ষিধেটা চাগিয়ে উঠল। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। আকাশের দিকে তাকাল। হাতে ঘড়ি নেই। ভাবল সূর্য দেখে আন্দাজ করে নেবে ক'টা বাজতে পারে। তা আর হলো না। শালার সূর্যটাও এমন রাগী চোখে তাকাল যে সে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে হয়ত। কিন্তু বাইরে তো খাওয়া যাবে না। পকেটে মাত্র দশ টাকা আছে। মাস শেষ। অবশ্য চাকরিটা হয়ে গেলে এক তারিখে জয়েনিং। টিউশনির টাকা তো পাবেই দু'একদিনের মধ্যে। বাসায় আলু, মরিচ, লবণ আছে। গলির মোড়ের মুদি দোকান থেকে আধা কেজি চাল কিনে আলু ভাতে খেয়ে নেবে। রাতেও তাতেই হয়ে যাবে। আধা কেজি চাল আট টাকা নেবে। আরও দু'টাকা পকেটে থেকে যাবে। দশ টাকার কথা মনে হতেই পকেটে হাত দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয় নোটটার অস্তিত্ব। ঘামে ভিজে নোটটা বাসি পাপড়ের মতো নেতিয়ে গেছে। একসময়ে কড়কড়ে ছিল।

গ্রামের ছেলে গ্রামের কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে ঢাকায় এসেছে চাকরির খোঁজে। বাপ নেই। ছিল। বাবা এখন অতীত। যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। ছিল। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে চিকিৎসার অভাবে মারা যান। বাড়িতে বৃদ্ধ মা রোগগ্রস্ত। বোনটা ক্লাস নাইনে। ভাইটা প্রাইমারি। থাকে জগন্নাথ সাহা রোডের নিচতলার একটা মেসে। ভাড়া। স্যাঁতসেতে একটা রুম। সিঁড়ির পাশেই। দিনের বেলায়ও বোঝা যায় না রাত না দিন। টিকটিকি, আরশোলা আর মাকড়সা সাথি। ইঁদুর আর ছুঁচো আসে মাঝেমধ্যে অতিথি হিসেবে। এক রুমে চারজন ব্যাচেলর বেকার ভাড়া থাকে। এক রুম। দু'চৌকি। চার মানুষ। আট চটি। কসিরুদ্দিন স্বল্প বেতনের কর্মচারী। ছোট মেয়েকে সবুজ পড়ায়। বড় মেয়ে আয়েশা বার দুই উচ্চ মাধ্যমিক ফেল দিয়ে এখন সবুজের পড়ানোর সময় চারপাশে ঘুরঘুর করে। টের পেয়েও কিছু বলে না কসিরুদ্দিনের বউ। কারণ, সবুজ এত চাকরির ইন্টারভিউ দেয়; একটা না একটা লেগে যাবেই। তখন আর আটকাবে না। আয়েশা তাই ঘুরঘুর করে, গুণগুণ করে; সবুজের চোখে চোখ পড়লে মুচকি একটু হাসে বাংলা ছবির নায়িকার ঢঙে। ক্লাস থ্রির আর একটা টিউশনি অবশ্য আছে সবুজের। দু'টো মিলে সাত+ছয়, তেরোশো টাকা আয়। তাই দিয়ে চলে যায় কোনোমতে। এর বেশি লাগে না মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের। স্বপাকে আলুসেদ্ধ আর ভাত। টিউশনি বাসায় অবশ্য চা আর নোনতা বিস্কুট কিংবা টোস্টে বিকেলের নাশতা। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত আর সমস্যা হয় না। কিন্তু জিওলের আঠার মতো হতাশার যন্ত্রণা সারক্ষণ লেগে থাকে মনে।

অফিস শুরু হলেই শুরু হয় অফিস টু অফিস ডিউটি। চাকরি করতে নয়, চাকরি খুঁজতে। পত্রিকার পাতা থেকে কাটা বিজ্ঞাপনের টুকরো, দরখাস্ত, সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্রসহ একটা কোর্ট ফাইল বগলদাবা করে চলে তার শহর পরিভ্রমণ। রাতটা ভালো ঘুমুনোর জন্য দুপুরটা সে ঘুমোয় না। বিকেল তিন-সাড়ে তিনটায় বেরিয়ে পড়ে। পাশাপাশি দু'টো পড়ানো শেষ করেই সোহ্‌রাওয়ার্দি পার্ক। ড. আহমদ শরীফের মজলিস। ওটা তার বিকেলের নাশতা। বিনে পয়সায়। সে খুব মজা পায়। সারদিনের সমস্ত গ্লানি এখানে এসে ধুয়ে মুছে যায়। কী চমৎকার সব জীবনঘনিষ্ঠ কথা তিনি বলেন। শুনলে জীবনের মরা গাঙেও যেন স্রোত বয়। তাই রোজ তার এ আসরে আসা চাই-ই। এটা তার নৈমিত্তিক ব্যাপার। সান্ধ্যকালীন আড্ডা।

এরপর আড্ডা ভেঙে গেলে ক্রমশ জনশূন্য হতে থাকে সোহ্‌রাওয়ার্দি পার্ক। এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে গণ ও গণিকার আনাগোনা। সে থেকে যায় আরও কিছুক্ষণ। জীবনটাকে কাছ থেকে দেখে। দেখে তার কদর্য রূপ, বীভৎস চেহারা। পার্কের আলো আঁধারিতে রিক্সাওয়ালা থেকে গাড়িওয়ালা সবাই সমান। মুটে মজুর আর বাবুতে কোনো তফাৎ নেই। সে পলাতক বেড়ালের মতো ঘাপটি মেরে দেখে। সে বুঝতে পারে জীবনের সব ক্ষেত্রেই মানুষ মানুষকে ঠকায়। একদিন সে দেখতে পায়– এক লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। পেছনে তাড়া করছে

এক মহিলা। শোনে তার অকথ্য গালাগাল– 'এই খানকি মাগির পুত; ট্যাহা না দিয়া পালাস ক্যান? ট্যাহা নাই পকেটে? কাম করবার সময় মনে ছিল না? ফুটানি মারতে আইছোস? এই ফকিরনির পোলা... '। লোকটা টাকা না দিয়ে পালাচ্ছে। পেছনে ছুটছে একজন নারী। তার দেহ বিক্রির টাকা মেরে দিয়ে পালায় একজন প্রতারক পুরুষমানুষ। এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যায় সবুজ। এ ও কী সম্ভব? সে দেখতে পায় মেয়েটা লোকটার নাগাল না পেয়ে ছুটতে ছুটতে এক পর্যায়ে তার পা থেকে স্যান্ডেল খুলে ছুঁড়ে মারে। কান্না আর গালির শব্দ মিশে একাকার হয়ে যায়। সবুজ আর বুঝতে পারে না তার কথাগুলো। ক্যাসেটের ফিতে জড়িয়ে যাওয়া রেকর্ডের মতো তার কথাগুলো অস্পষ্ট শব্দদূষণ সৃষ্টি করে।

ঘরে ফিরে কোনো কাজ নেই সবুজের। লোডশেডিং তো আছেই। ফ্যানও নেই। গরমে নিজেই আলুসেদ্ধ। অসহ্য যন্ত্রণা। রাতে ফিরে দুপুরে রান্না অবশিষ্ট ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে, নইলে আলু ভাতে মেরে দিয়ে; পুরনো, ছেঁড়া বড়ালের বিসিএস গাইডটা একু নাড়াচাড়া করে। বালিশের নিচ থেকে বের করে পর্ন পত্রিকা পড়ে, পড়া শেষ করে আবার রেখে দেয় বালিশের নিচে। তাতে ইন্টারভিউতে পাস করে চাকরির পথ কতটা সুগম হবে তা সে জানে না; তবে একটু সান্ত্বনা পাওয়া যাবে এইটুকু জানে। তাই বেশ রাত করেই সে বাসায় ফেরে। সান্ধ্য আড্ডা শেষ হলেই সে বেরিয়ে পড়ে জীবন-দর্শনে। পার্কের আলো আঁধারিতে হাঁটে; দেখে সে আলো আঁধারির খেলা। কাছ থেকে। জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে সে দেখে জীবনের তামাশা। তারপর রাত হলে এইসব জীবন-যাপনের প্রতি থুতু ছিটিয়ে ফিরে আসে বাসায়। এই তার নিত্যদিনের যাপিত জীবন। দৈনন্দিন কর্মসূচি।

মনটা খুব ভালো সবুজের। আজ রেজাল্ট দেবে। চাকরিটা হযে যেতে পারে। কিন্তু স্যান্ডেলটা ক্ষয়ে যাওয়ায় মনটা খারাপ লাগছে। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে; যদিও দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে স্যান্ডেলের তলিটা ক্ষয়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যে তালি দিতেও পারবে না। পকেটে আছে মাত্র দশ টাকা। বাকি দু'দিন চলতে হবে ধার করে। তার চোখেমুখে কেমন এক অসহায়ত্বের ছাপ। সে কারণেই হয়ত মনে হয় সবুজ কাঁদছে।

রাস্তার মোড়ে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে এক গেলাস পানি খেয়ে নিল সবুজ। শুধু পানি খেতে পয়সা লাগে না। জলে ক্ষিধে মরে। বহুদিন পর গতকাল একটা মিষ্টি খেয়েছে সবুজ। সেই মিষ্টির স্বাদটা মনে করে পানি খেল। মিষ্টিটা দিয়েছিল আয়েশার মা। এনামেল উঠে যাওয়া এ্যালুমিনিয়ামের পিরিচে ফ্রিজ থেকে বের করা ঠাণ্ডা একটা বাসি মিষ্টি; আর পাশে ছোট্ট একটা চামচ। সাথে এক গেলাস পানি। ঠাণ্ডা। গতকাল মিষ্টি দেয়ার একটা কারণ ছিল। আজ তার চাকরি হতে পারে এ খবর আগেই সবুজ তাদের জানিয়েছে। তাই এ আদর। এ আদর পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে সে চাকরি পাওয়ার কৃত্রিম গল্পও ফাঁদে।

পানি খেতে খেতে কসিরুদ্দিনের বউয়ের মুখটা আয়েশার মুখে পরিণত হয়ে যায়। আয়েশা তাকে ভালোবাসে বোঝা যায়। সেদিন মিষ্টিটা শেষ হতে চায়ের কাপ হাতে আয়েশা। মিষ্টি হেসে চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বলে– 'আপনার এই চাকরিটা হয়ে গ্যালে সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবে বলেন তো?' অতকিছু না ভেবে সবুজ বলে ফেলেছিল– 'কেন, আমার মা?' বলতেই সবুজ লক্ষ করল মরা চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল আয়েশার মুখ। আয়েশার ঠোঁটের সেই মিষ্টি হাসিটা তখনও ছিল; কিন্তু কেমন বাসি ফুলের মতো। সবুজের খারাপ লেগেছিল– বোকার মতো কোনোকিছু না ভেবেচিন্তে বেফাঁস বলে বেচারিকে কষ্ট দিয়েছে। আয়েশার করুণ মুখটা মনে পড়তেই তার ভেতরটা হুহু করে উঠল। মনে মনে ভাবে– চাকরিটা হয়ে গেলে আয়েশার মনের কথা জেনে নেবে। আয়েশা ছোট্ট একটা টুনটুনি হয়ে তার পাঁজরের ডালে বসে। ডালটা একটু দুলে ওঠে। মনে পড়ে আরেকজনের কথা। গ্রামের। পাশের বাড়ির আসমা। টাকার অভাবে মাধ্যমিক দেয়া হয় নি। সবুজের সাথে তার বেশ ভাব। ঢাকা চলে আসার সময় তার ছলছল চোখটা সবুজের মনে পড়ে। বলেছিল– 'চিঠি দেবে তো?'

প্রথম প্রথম নিয়মিত চিঠি লিখত সবুজ। আসমাও লিখত। তারপর আসমার চিঠি আসত কিন্তু সবুজের আর ঘন ঘন লেখা হতো না। চিঠি প্রতি ডাকমাশুল এক টাকা থেকে দু'টাকা করেছে সরকার। প্রতিটা চিঠি পোস্ট করতে এখন দু'টাকা লাগে। সবুজের জন্য সেটাও সমস্যার হয়ে গেল। একসময়ে আসমার চিঠি আসত, সবুজের চিঠি যেত না। কবে যেন একদিন আসমার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম প্রথম আসমার চিঠি না

এলে মনটা খারাপ হয়ে থাকত সবুজের। চিঠি পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকত। ধীরে ধীরে আসমার চিঠি আসা বন্ধ হলেও সবুজ টের পেল না যে বসন্তের পাঁজরের ডালে নতুন পাখির শিস্, তখনই আসমা নতুন করে হাওয়ায় দোলা দিয়ে উঠল। একই সাথে আয়েশা এবং আসমা দু'জনের জন্যই মনটা হু হু করে উঠল সবুজের।

দু'গেলাস জল মেরে দিয়ে আবার পথে নামে সবুজ। পথ মানে রাস্তা। কালো পিচ ঢালা রাস্তা। মাথার উপরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর আর পায়ের তলে কালো রাস্তা। এটাই যেন সবুজের কাছে একমাত্র সত্য। হাঁটছে। হাঁটাই যেন তার একমাত্র কাজ। হঠাৎ তার মনে হয়, পিচঢালা কালো রাস্তাটা যেন কোনো পেন্সিলের দাগ। বিরাট এক কাগজে কোনো শিশু এলোপাতাড়ি দাগ দিয়ে রেখেছে। সে সেই দাগের উপর দিয়ে হাঁটছে। নাকি সেও দাগের উপর দিয়ে দাগ কাটছে। সে কি তবে এক চলন্ত পেন্সিল? দাগ কাটতে কাটতে ক্ষয়ে যাবে? রাজপথে হাঁটছে সবুজ। নিজেকে চলন্ত পেন্সিল মনে হচ্ছে। এক সময় সে অনুভব করে পেন্সিলের নিচে যেন জ্বালা করছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে। থামে। ডান পা-টা তুলে দেখে– স্যান্ডেলের ছেঁড়া দিয়ে রাস্তা তার দাঁত বসিয়েছে পায়ে। কালোর মাঝে ছোপ ছোপ লাল উঁকি দিচ্ছে। জ্বালাটা না থাকলে, দেখতে মন্দ নয়। ইচ্ছে করেই গতিটা কমিয়ে দেয়। দেখলে মনে হবে আয়েশ করে হাঁটে। ছেঁড়া চটি পায়ে হাঁটায় অনেক হ্যাপা। জীবনটা যেন ছেঁড়া স্যান্ডেল। টেনে টেনে চলা।

দুই

এক সময় পৌঁছে যায় গন্তব্যে। দোতলার সিঁড়িতে পা দিতেই হার্টবিট বেড়ে যায় সবুজের। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সবুজ অফিসার। চাকরিটা পেয়ে যাবে। মানে চাকরি প্রাপ্তদের নামের তালিকায় তার নাম দেখবে। তার নামটা কোথায় থাকবে? এক নম্বরে? নাকি মাঝের দিকে? নাকি শেষে? থাক, এক জায়গায় থাকলেই হলো। বোর্ডে তার নাম থাকার সাথে সাথেই তার মায়ের অসুখ ভালো হয়ে যাবে। বোনের গায়ে উঠবে নতুন জামা। তার স্যান্ডেলে তলি লাগবে। না, ওটা ফেলে দেবে। নতুন চটি হবে। একটা জামাও কিনবে। এটা কোনো ফকিরকে দিয়ে দেবে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠে আর ভাবে। ভাবে আর ওঠে। হার্টবিট বাড়তে থাকে। মনে হয় এরপর থেকে যখনই সে এভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে দারোয়ান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম ঠুকবে– 'সেলামআলায়কুম স্যার, শরীর ভালো?' সে বলবে– 'মোটামুটি, একটু গ্যাস হয়েছে এই যা'। হঠাৎ মনে পড়বে তার স্ত্রী এ্যান্টাসিড দিতে ভুলে গেছে। স্ত্রীর মুখটা মনে আসে। তাঁতের শাড়ি পরেছে। কিন্তু স্ত্রীর মুখটা যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে আয়েশার মুখ। একবার মনে হচ্ছে আসমার মুখ। আয়েশা-আসমা, আসমা-আয়েশা– এভাবে মুখের লুকোচুরি খেলা চলে। কোনোভাবে স্থির হয় না মুখ। দোতলায় উঠে আসে। দারোয়ান বসেই থাকে। সালাম দেয় না। 'সালাম দেয় না কেন?' হঠাৎ তার খেয়াল হয়– সে তো রেজাল্ট নিতে এসেছে। এখনই সালাম দেবে কেন? দেখে অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে। কেউ উৎফুল্ল। কেউ মলিন মুখ। তার হার্টবিট আরো বেড়ে যায়। ওই তো বোর্ড। নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয়।

পা-টা ভারি। যেন চলছে না। এত হাঁটতে পারে সবুজ আর এটুকু পথ পেরুতে পারবে না? এই দশ-বারো হাত এগিয়ে আসতে যেন দশ-বারো বছর লেগে গেল সবুজের। তবু পৌঁছল। বোর্ডে ফোকাস করল। প্রথম থেকেই নামগুলো ঝটপট পড়তে লাগল। লাফিয়ে লাপিয়ে। দ্রুত। তার তর সইছিল না। হঠাৎ নামের লিস্ট শেষ। ভাবল জাম্প করে যাওয়াতে তার নামটা চোখে পড়ে নি। এবার তাই ধীরে, এক এক করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়। দৃষ্টি ওপরে নিয়ে ফোকাস এ্যাডজাস্ট করতে মনোনিবেশ করে। কিন্তু আশ্চর্য! ফোকাস এ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। কী মুশকিল! তাহলে সে তার নামটা পড়বে কী করে? ইতোমধ্যে অক্ষরগুলো একটার গায়ে একটা জড়িয়ে গেছে। শুধু কি তাই? অক্ষরগুলো যেন জড়াজড়ি করে নড়াচড়া করছে। গুয়ের পোকার মতো কিলবিল করছে। কী আশ্চর্য! অক্ষরগুলো ইংরেজি না বাংলা তাই বোঝা যাচ্ছে না এখন। অক্ষরগুলো কেমন দাঁত উঁচিয়ে হাসছে। ওদিকে চোখের ফোকাস কোনোভাবেই ঠিক হচ্ছে না। সে মরিয়া হয়ে চেষ্টা

করছে। এবার সে শুধু উপর থেকে নিচ করছে দৃষ্টি। কিন্তু অক্ষরগুলো আরও সচল হয়ে উঠছে। আশ্চর্য! এমনও কি কখনও হয় নাকি? অক্ষরগুলো মৌমাছির মতো ভনভন করছে। এবার উড়ছে। একটা নয়, দু'টো নয়, শতশত মৌমাছি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে। সবগুলো নাম উড়ছে। তার নামও মৌমাছি। গুনগুন। ভারি মজা। কিন্তু এ কী? মৌমাছি তার গায়ে হুল ফোটাচ্ছে। তার চোখেও। সে কি মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছে নাকি? তাহলে অক্ষরগুলো মৌমাছি কেন? চোখ বন্ধ করে ফেলে সবুজ। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে। বসে পড়ে। পাশেই দারোয়ানের টুলটা খালি ছিল। আকাশ জুড়ে মৌমাছি। আর মগজ ঘিরে হুল।

চোখের সামনে থেকে মৌমাছি সরে যেতে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ায় সবুজ। হাল্কা নয়। পা-টা খুব ভারি মনে হয়। দু'পায়ে দু'মণই পাথর বাঁধা। ব্যথা। ধীরে ধীরে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। তলপেটে চাপ। টয়লেটে ঢুকে পড়ে। পেচ্ছাব করা খুব জরুরি। পেচ্ছাব করতে গিয়ে ইচ্ছে জাগে– প্যানের মধ্যে করবে না। দেয়ালে ছিটিয়ে দেয় পেচ্ছাব। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দেয়ালে আঁকিবুকি আঁকে উষ্ণ জলের ধারায়। হঠাৎ তার খেয়াল হয় দেয়ালে সে বটগাছ আঁকবে। পেচ্ছাবের বটগাছ। তাই আঁকে। পাশে এক লম্বা তালগাছ। দেয়ালচিত্র এঁকে বাইরে আসে। বেসিনে এসে ভালো করে চোখে, মুখে, নাকে জলের ঝাপটা দেয়। তারপর ভিজা জামার হাতায় মুখ মুছে হাঁটা শুরু করে। বোর্ডের দিকে আর তাকায় না। ততক্ষণে অফিস লন প্রায় খালি। দারোয়ান তার টুলে বসা। সালাম ঠোকে না। সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে নামে। এবার সে সিঁড়ি গুণে গুণে নামে। নিচে। যেন কত সিঁড়ি নিচে নেমে যাচ্ছে তার হিসেব খুব জরুরি।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আবার চলন্ত পেন্সিল। গন্তব্যহীন। কিন্তু এবার গতি ধীর। ক্ষিধে নেই। তৃষ্ণাও। বাসায় যাবার দরকার নেই। পড়াতেও যাবে না আজ। কী বলবে গিয়ে তাদের? তার চাকরি হয় নি? নাকি হয়েছে; তবে অক্ষরগুলো পড়তে পারে নি? হঠাৎ করে কেমন মৌমাছির মতো ওড়াউড়ি শুরু করল। শুধু কি ওড়াউড়ি? গায়ে, চোখে, মুখে পর্যন্ত হুল ফোটাতে শুরু করল। দিশেহারা নদীর মতো সে গতিপথ পাল্টাতে থাকল। যতই গতিপথ পাল্টাক, নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছায়, সবুজও তেমনি ড. আহমদ শরীফের আড্ডায় গিয়ে পড়ল। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দি পার্ক তখনও ফাঁকা। তখনও আড্ডা বসে নি। কেউ আসে নি। ড. আহমদ শরীফ যেখানে বসেন, সেখানে তার বসার সাধ হলো। বসল। আহমদ শরীফের ভঙ্গিতে সামনে বসে থাকা অদৃশ্য জনতার উদ্দেশ্যে সে বলতে লাগল নানা কথা। একসময় সে সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখল– সামনে বসে তার ভাষণ শুনছে চার-পাঁচজন শিশু; বাদাম বিক্রেতা, পানি বিক্রেতা এবং টোকাই। একটু লজ্জা পেয়ে হেসে দিয়ে– 'একটু রিহার্সেল দিচ্ছিলাম আর কী'।

রোদের তেজ পড়ে নি তখনও। একটু ছায়ার খোঁজে সে একটা ঝোপের কাছে চলে আসে। বসে। দেহটা শীতল হয়ে যায়। হঠাৎ ফুসুর ফাসুর কানে আসে। ডালপালার ভেতর দিয়ে ঝোপের অন্য পাশে চোখে পড়ে জড়াজড়ি করে বসে থাকা যুবক-যুবতী।

ছেলেটা– তোমার মাকে বলেছ?

মেয়েটা– কী বলব? তোমার চাকরি নেই এ কথা শুনলে মা রাজি-ই হবে না।

– এবার দেখো হয়ে যাবে। ইন্টারভিউটা ভালোই দিয়েছি।

ঝোপের এ পাশে সবুজ আপন মনে গাল দেয়– চাকরি না বাল হবে নে। এত সোজা? আমার হলো? চাকরি ভরে মুতি।

বিড়বিড় করে এসব বলতে বলতে ঝোপের ওপাশে দেখে– দু'টো দেহ এক হয়ে মিশে গেছে। ছেলেটার মুখের মধ্যে মেয়েটার ঠোঁট অদৃশ্য। সেও মনে মনে দু'জন হয়ে যায়। তার বাহুবন্ধনীর মধ্যে আয়েশা কিংবা আসমা। কে, তা ঠিক বুঝতে পারছে না। চোখ বন্ধ করে সবুজ। আয়েশা কিংবা আসমা কারো মুখই মনে করতে পারছে না। তার মাথা এখন ফাঁকা। সাদা। কোরা কাগজ। মনে হলো এখানে কোনো লেখা নেই, রেখা নেই; কোনো ছবি নেই। কিছুতেই কোনো ছবি ভেসে উঠছে না স্মৃতির সে সাদা কাগজে। তার প্রবল কান্না পায়। এরা কেউ-ই তার হবে না। কে বিয়ে করবে বেকারকে না খেয়ে মরতে? ওই যে ঝোপের ওপাশে যে মেয়েটা

তার সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছে অনায়াসে একটা যুবককে, সেও ওই যুবককে বিয়ে করতে চাইছে না চাকরি নেই বলে। কী আশ্চর্য পৃথিবী! চাকরি হবে শুনেই না আয়েশার মা তাকে একটা মিষ্টি খেতে দিয়েছিল। আর কি দেবে? কেউ যেন তার মনের পাতা থেকে ইরেজার দিয়ে মুছে দেয় পেন্সিলে আঁকা ছবি।

কোনোভাবেই সে মনে করতে পারে না আসমা কিংবা আয়েশার মুখ। একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে আটকে থাকে গলার কাছে। মন থেকে চেহারা কীভাবে মুছে যায় সে বুঝতে পারে না। মনে পড়ে– ছেলেবেলায় খাতা ভরে ছবি এঁকে রেখেছিল। একবার দোয়াত থেকে কলমে কালি ভরার সময় দোয়তটা খাতার উপর কাৎ হয়ে পড়ে গেলে, পুরো ছবি কালিতে ঢেকে যায়। ছবিটা হয়ে যায় কালো কালির মাঠ। কোনোভাবেই আর ছবিটা উদ্ধার করার উপায় থাকে না। সে কী কান্না তার! বাবা সান্ত্বনা দিয়েছিল। আজ মনে হয় আর একবার তার মনের পটে আঁকা ছবির উপর কেউ কালির দোয়াত উল্টে দিয়েছে; আর কোনোভাবেই উদ্ধার করা যাবে না তার চেতনার রঙে আঁকা ছবি। তার কল্পনা-সঙ্গীকে। বাবার মুখটা মনে পড়ে। বাবা যদি যুদ্ধে না যেত তবে আজ তারা এমন করে পথে বসতো না। ছেলেবেলায় বাবার মুখে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছিল। পাকিস্তানি আর্মির সাথে গোলাগুলির এক পর্যায়ে বাবার উরুতে গুলি লাগে। পাশে ছিল জয়নালচাচা। গুলিতে মারা যান। জলকাদামাখা ধানক্ষেতে পড়ে থাকে বাবা। অজ্ঞান অবস্থায় পরদিন এলাকাবাসী উদ্ধার করে তাঁকে। রাজাকারের ভয়ে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় নি। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার চিকিৎসা করেন গোপনে। আর যুদ্ধ করতে পারেন নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তিনি পঙ্গু হয়ে গেলেন। টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করানো যায় নি। ভুগে ভুগে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে তিনি মারা যান। সেই থেকে তারা এতিম। বাবা বলেছিল– আমি যখন গুলি খেয়ে ধানক্ষেতে পড়ে ছিলাম অজ্ঞান হয়ে, তখন তোর ওই কালো হয়ে যাওয়া ছবিটার মতো আমারও সব স্মৃতি কালো হয়ে গেছিল। আশা ছাড়বি না।

কালো এক কালকেউটে সবুজের মগজের মধ্যে কিলবিল করে আর বিষ ছড়ায়। সবুজ দগ্ধ হতে থাকে। সময় ছুটে যায় ঝোপের ছায়া ছুঁয়ে। সবুজ দেখতে পায় ঝোপের ওপাশ যুগল-শূন্য। পার্কের নিয়ন বাতি জ্বলে উঠেছে। অলস কুকুরের মতো উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দেয়। তারপর হাঁটা শুরু করে ড. আহমদ শরীফের মজলিসের দিকে। শুরু হয়ে গেছে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সে গিয়ে পিছনের দিকে ফাঁকা একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল। কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। সে যেন শুকনো পাতা। গাছের ডাল থেকে এইমাত্র খসে পড়ল। কারো দৃষ্টি কাড়ল না। সন্তর্পণে সবার দিকে তাকায়। দেখে। সবাইকে এফোঁড় ওফোঁড় করে পর্যবেক্ষণ করে। সবাই ড. আহমদ শরীফের দিকে তাকিয়ে আছে। সবুজই শুধু চোরের মতো সবাইকে দেখছে। সে যেন সবার মনের ঘরে চুরি করছে। ধরা পড়ার ভয়ে বুকের মধ্যে ধুকপুক। সবুজের মগজের মধ্যে চিন্তার এক চিল ডিগবাজি খায়। এখানে যারা সবাই হাঁ করে ড. শরীফের কথা গিলছে, এদের কেউ কি তার মতো? একজনও কি আছে? নাকি মনের ক্ষত লুকিয়ে গান্ধীজি মার্কা মুখ করে বসে আছে? এতলোক প্রতিদিন কী জন্যে আসে? কোন আশায় বা কোন হতাশায়? সবাই কি তার মতো প্রলেপ দিতে আসে? আজকের আড্ডাটা কেমন যেন জমছে না। কিংবা জমছে কিন্তু সবুজের মনটা ভালো নেই বলে হয়ত তার কাছে মনে হচ্ছে জমছে না। অবশ্য তার মন তো প্রায়শই খারাপ থাকে। তবে আজ একটু বেশি খারাপ।

তিন

আড্ডা শেষ হয় এক সময়। 'সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী; ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন, থাকে শুধু অন্ধকার...'। আড্ডার সবাই যে যার বাসায় ফেরে। ফেরে না শুধু সবুজ। কোথায় ফিরবে? তার জন্যে তো কোনো 'বনলতা সেন' অপেক্ষায় বসে নেই। আছে শুধু সিন্দুকের মতো একটা ঘরে আরশোলা, চামচিকে, মাকড়সা। তিন ফুট বাই সাত ফুট একটা খাটে দু'জন। এর চেয়ে পার্কই ভালো। উদোম আকাশ, খোলা বিশাল ঘাসমাঠ। আজ সে সারা মাঠ গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমুবে। পুরো পার্কটাই তার বিছানা। পুরো পার্কটাই তার ঘর। খুব হাল্কা লাগছে শরীরটা। মনটাও। যেন ফাটা কার্পাস তুলো। ভেতর থেকে কী এক বেগ তাকে ঠেলে। মুক্ত। নিজকে মনে হয় লাগাম ছেঁড়া। স্যান্ডেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ছুটছে। ছেঁড়া জামা প্যান্টও তার ছুঁড়ে

ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু সে সময় কই? সে ছুটছে। যে কেউ দেখলে মনে করবে ডাকাতের তাড়া খাওয়া মানুষ। সবুজের পায়ের নিচে সবুজ, থেঁতলে যাচ্ছে কচি কচি ঘাস। সে ছুটছে। যেন ছুটবে সারারাত। সারা জীবন। যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ সে ছুটবে; যেন এই তার পণ।

ছায়া যেখানে গাঢ়; ঝোপ-গাছগাছালির ভিড়– দূর থেকে দেখতে পায় সবুজ মানুষের কিউ। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দশ-বারোজন মানুষ। যেন কলপাড়ে জল নিতে আসা মানুষের লাইন। রেশনের দোকান খুলল নাকি? সব জায়গাতেই মানুষের হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, মারামারি; কে আগে যাবে, আগে পাবে– এই মতলব। এই একটা জায়গায় মানুষকে চুপচাপ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এত কষ্টের মধ্যেও তার ভালো লাগল। সে ব্রেক কষল। গতিবেগ কমিয়ে দিক পাল্টে সে লাইনটার দিকে এগুলো। আবছা আলোয় মানুষগুলোকে প্রেতের মতো লাগছিল। প্রেত লাইনের সামনে যেখানে এক টুকরো অন্ধকার বিছানো, সেখানে কী যেন নড়েচড়ে উঠছে। কিছু না ভেবেই প্রেত লাইনের শেষে এসে সবুজ দাঁড়িয়ে যায় জাদুর টানে। আবছা আলোয় পেছন থেকে মুখগুলো দেখা যায় না। ভালো করে লক্ষ করতে চেষ্টা করে সবুজ– সামনে কী একটা নড়েচড়ে মাটিতে বিছানো ঘাসের শয্যায়। তার পাশে একজন প্রেত লাইনের দিকে মুখ করে, চারদিক ঘুরেঘুরে নিলাম ডাকে–

– আহেন, আহেন, মাত্র দশ ট্যাকা, একদাম দশ ট্যাকা, সস্তায় দশ ট্যাকা, নিলামবালা দশ ট্যাকা, কী চমৎকার দশ ট্যাকা, ভারি মজা দশ ট্যাকা, আহেন ভাই দশ ট্যাকা।

সবুজ বুঝে উঠতে পারে না এটা কোন ধরনের রেশনের দোকান। মাত্র দশ টাকায় কী পাওয়া যায়? সবুজের মনে পড়ে– তার পকেটেও দশ টাকা আছে। পকেটে হাত দিয়ে সে নিশ্চিত হয়। আছে। দশ টাকা। তার শেষ সম্বল। রাতের খাবার। প্রয়োজন নেই। এতক্ষণ তার ক্ষিধের বোধ ছিল না। খাবারের কথা মনে পড়তেই পেটের অজগরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু পাত্তা দিল না।

শেকলের গাঁটের মতো একটা একটা করে খসে যায় মানুষ কিংবা মানুষ আকৃতির প্রেত। দাঁড়ানো মানুষগুলো একটা একটা করে পড়ে নিচে, মাটিতে, বিবর্ণ ঘাসে। লাইনটা ছোট হয় কিংবা এগিয়ে যায় কিংবা এগোয় না, জায়গাতেই থাকে শুধু গাঁটগুলো এগিয়ে যায়। এরকম করে এগিয়ে যায় সবুজও। কাছ থেকে দেখে সবুজ এবার বুঝতে পারে। পেছন ফিরে দেখে তার পেছনেও শেকলের গাঁট এসে জুড়েছে। সে এখন শেকলের মাঝখানে। শেকলের গাঁট ছোটে কিন্তু শেকল ছোট হয় না। কী এক আশ্চর্য জাদুর শেকল! তলপেটে সবুজ দু'রকম ব্যথা টের পায়। খাবারের কথা মনে হতেই যেমন তার ক্ষিধে কামড় বসিয়েছে পেটে, সামনের নড়াচড়া দেখেও তলপেটে ফণা তুলেছে কাম। সবুজ বুঝে উঠতে পারে না কী করা উচিত বা কী সে করবে। পকেটে মাত্র দশ টাকা।

দু'টো ক্ষুধা। প্রতিটারই দাম দশ টাকা। কিন্তু তার পকেটে একটিই মাত্র দশ টাকা। ভেবে পায় না– শ্যাম রাখে, না কূল রাখে। ছোট না হওয়া শেকলের সামনের গাঁট ছোটে, সবুজ এসে পড়ে প্রান্তে। কানে আসে– 'আহেন দশ ট্যাকা, নিলামবালা দশ ট্যাকা, একদাম দশ ট্যাকা ... '। কথাগুলো যেন এক একটা বুলেটের মতো তার কানে এসে আঘাত করে। ঢুকে পড়ে মগজে, চৈতন্যে। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে জ্বালা। কী করবে সে? সে দেখতে পায় চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে আয়েশা আসমা প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়ায়। কাউকে সে নাগাল পায় না। ধরতে পারে না। ছুঁতে পারে না। জীবনে হয়ত কোনো নারীই আসবে না তার। এক গণ্ডূষ জল যখন হাতে এসে ধরাই দিল, তাকে উপেক্ষা কেন? পান করাই উত্তম। সততা আদর্শ শুকনো পাতার মতো পায়ে দলে গুঁড়ো হয়ে যায়।

শেকলের প্রথম কিংবা শেষ গাঁট সবুজ। একটু পরেই সে খসে যাবে। সামনে তার মায়াবী হাতছানি। পেছন ফিরে তাকায়। যেখানে সে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল, লাইনের শেষে, সেখানে এখন অন্য মানুষ। লাইনটা এখনও ততটুকুই। শেকলটা যেন ছোট হতে জানে না। সামনে এক একটা গাঁট খসে পড়ে, আবার পেছনে এক একটা গাঁট জোড়া লাগে। এ এক অদ্ভুত শেকল।

A chain of unending. সবুজ ভাবে এক বিকেল না খেলে মানুষ মরে না। আজ নবজন্ম লাভ করি। একটা ক্ষিধে মিটাই আর একটা উপোস দেই। অদ্ভুত এক অনুভূতি খেলা করে সবুজের মনে। কানে আসে–

'আহেন ভাই, দশ ট্যাকা ফেলেন, এ্যাডভান্স'। ভৌতিক আলোয় সবুজ দেখতে পায় ঝোপের ছায়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে এক উদোম শরীর। বেশরম নারী। এখানে লজ্জাহীনতাই যেন নারীর ভূষণ। এর আগে এ দৃশ্য কখনও দেখে নি সবুজ। নাগালের কত কাছে নারী। মাত্র দশ টাকায় এক উদোম শরীর। মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়– 'এ্যাডভান্স মানে?'

– 'বোঝেন না, কাম শ্যাষ, তো খানকির পুতেরা ট্যাকা না দিয়াই দৌড় লাগায়। হক্কলেরেই চেনা আছে। এরা আবার ভদ্দললোক! বেশ্যার গতর বেচা দশ ট্যাকাও মারতে চায়। ফ্যালেন, ট্যাকা ফেলেন'। পকেটে হাত দেয় সবুজ। বের করে আনে দশ টাকার একটা নোট। এখন অবশ্য ভেজা নেই। ঘাম শুকিয়ে গেছে। তবে নোটা কেমন ওই মেয়েটার মতোই নেতানো। এগিয়ে দেয়। মেয়েটা লুফে নেয় মুঠোতে। দশ টাকা নয়, যেন একটা স্বর্গ। সবুজ টের পায় সব নোটগুলো মেয়েটার হাতে। তার দালাল শুধু নিলাম ডেকে ডেকে খদ্দের যোগাড় করে। দালালটাকেও মেয়েটা বিশ্বাস করে না। উদোম গা বলে কোচরও নেই যে টাকা রাখবে। তাই এক হাতের মুঠোয় আবদ্ধ মুঠো মুঠো লজ্জা।

সবুজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে– সে যখন শেষে এসে দাঁড়িয়েছে লাইনের শেষে; তখনও তার সামনে ছিল দশ-বারো জন। এর আগেও হয়ত ছিল আরও কিংবা পরেও হয়ত আসবে আরও। কম করে হলেও ত্রিশ জন উপগত হয় এক নারীতে। জন প্রতি দশ টাকা, মানে ত্রিশ জনে তিনশো টাকা। মেয়েটা তিনশো টাকা মুঠো করে বাড়ি ফেরে? মানে মাসে ৩০ × ৩০০ = ৯,০০০ টাকা। সবুজ হতভম্ব হয়ে যায়– মেয়েটার মাসিক বেতন; না বেতন নয়; মাসিক রোজগার ৯,০০০ টাকা! সবুজ শুনেছে এখান থেকে কিছু টাকা কমিশন দিতে হয় দালালকে, কিছু পার্কের মাস্তানদের, আর কিছু কর্তব্যরত পুলিশকে। তারপরও হয়ত সাত-আট হাজার টাকা থাকে। ভাবে– চাকরির চেয়ে তো এটাই ভালো। ইনভেস্ট ছাড়া ব্যবসা। পরক্ষণেই মনে পড়ে– সে তো পুরুষ মানুষ। তার কাছে কে আসবে দশ টাকা নিয়ে।

ডাক আসে– 'আহেন, তরতরি আহেন, টাইম কম'।

সবুজ ভাবে কত সহজ সম্ভাষণ, সে যেন তার চিরদিনের চেনা। অচেনা পুরুষকে আহ্বান যেন জল-ভাত। সবুজের মগজের ভেতর ঝাঁকে ঝাঁকে তেলাপোকার ওড়াউড়ি। সে যেন সম্পূর্ণ চেতনা রহিত।

তখনও শেকল থেকে খসে পড়ে নি সবুজ। সে খেয়াল করে– ঝোপের ছায়ায় মেয়েটি তার বিবর্ণ সবুজ শাড়ি বিছিয়ে শয্যা পেতেছে কামের। দশ টাকার বিনিময়ে আহ্বান জানাচ্ছে একটি প্রেতের শেকল। শেকল থেকে এবার খসে পড়ে সবুজ। নিচু হয়। সে টের পায় প্যান্টের শক্ত কাপড় ঠেলে, ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার পৌরুষ। প্যান্টের চেন খোলে। হুক খোলে; বাইরে বের করে আনে উদ্ধত, শক্ত মাংস শলাকা। টের পায় অগ্রভাগ পিচ্ছিল, অন্তর্বাস উষ্ণ, ভেজা। মোহনার কাছাকাছি ঝুঁকে আসে সবুজ। যেন এখনই ভেঙে চুরমার হয়ে হারিয়ে যাবে অতলে। কিন্তু কী এক দুর্গন্ধে ভারি বাতাস। সবুজের গা গুলিয়ে ওঠে। ওয়াক আসে। চারদিকে রমণের গন্ধ, বাতাসে নানা প্রেতের পৌরুষের গন্ধ। এক একটা প্রেত উঠে যায়, আর মেয়েটি একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলে তার কামসিক্ত উরু। ন্যাকড়াটাও ভেজা হয়ে ওঠে। গন্ধে বমি আসে। কোনোভাবেই আর নিচু হতে পারে না সবুজ। উদোম শরীরের কণ্ঠনালী চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসে– 'দেরি করেন ক্যান? আহেন ভাই। শিগগির আহেন, টাইম কম'।

সবুজের কানে জ্বালা ধরে– মেয়েটা তাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করে সঙ্গমে আহ্বান জানাচ্ছে। মানুষগুলো কি পশু? এভাবে দশ টাকার বদলে ত্রিশজন একটা মেয়েকে ভোগ করবে? আবার ভাবে– অবশ্য সে কারণেই মেয়েটা এত রোজগার করতে পারছে। নইলে তো উপোস দিতে হতো। সে নিজকে মেয়েটার জায়গায় ভাবে– সবুজ যদি মেয়ে হতো, তার যদি সুযোগ থাকত, তাহলে সেও কি আজ নামত না এই ব্যবসায়? আজ সে দশ

টাকা দিয়ে মেয়েটার কাছে আসত না, বরং তার কাছেই দশ টাকা করে দিয়ে ত্রিশজন আসত। মেয়ে হয়ে না জন্মানোর জন্য সবুজের আফসোস হয়। সবুজ দোদুল্যমান।

– কী অইলো, নেন, কাম সারেন। চোদাইবার আইসা অত ভাবেন ক্যান? হালার কত পাগোল দ্যাখলাম। নেন, লাগান। তরতরি লাগান।

গা ঘিনঘিন করে ওঠে সবুজের। সে থুক্ করে একদলা থুতু ছুঁড়ে দেয় মেয়েটার গায়ে। উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটা কঁকিয়ে, ডুকরে, চেঁচিয়ে, দুহাতে মুখ চেপে কেঁদে ওঠে। দশ টাকার নোটটা ছুঁড়ে দেয় সবুজের দিকে– ভিক্ষা দ্যান, ভিক্ষা? ভিক্ষা আমি নেই না। গতর বেইচা দাম নেই। করুণা করেন? কত ভদ্দললোক দ্যাখলাম। আমি ইচ্ছা কইর‍্যা খারাপ হইছি? ঢাকা শহরে আইছিলাম প্যাটের লাইগ্যা।

চার

সবুজ ঘুরে দাঁড়ায়। সত্যি তার অন্যায় হয়ে গেছে। এভাবে ঘৃণা করা উচিত হয় নি। তার পাপ বোধ হয়। তাকিয়ে দেখে মেয়েটি যে সবুজ শাড়িটা বিছিয়ে শুয়েছে– তা বিবর্ণ, ধূসর, ফ্যাকাসে। নিয়ন বাতির মরা আলোয় মেয়েটিকে মৃত মনে হয়। শাড়িটা বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো বিছানো। বারোয়ারি মেয়েটি যেন মানচিত্রের আত্মা। ধর্ষণক্লিষ্ট যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মৃত মুক্তিযোদ্ধা বাবার কথা মনে পড়ে যায়। পা টলতে থাকে সবুজের। থরথর করে কাঁপে সারা শরীর। মেয়েটির চিৎকার সহস্র ধর্ষিতার আর্তচিৎকার হয়ে আছড়ে পড়ে বাতাসে। সবুজ দেখতে পায়– বে-আব্রু পড়ে আছে বাংলাদেশ। তার সামনে ধর্ষণোন্মুখ প্রেতের শেকল। অন্তহীন কিউ। আজ আবার তার স্মৃতির কাগজে কালির দোয়াত উল্টে গেছে। সব কিছু অন্ধকার দেখে। হঠাৎ কি সব আলো নিভে গেল শহরের? বাবার মুখটা মনে করতে চেষ্টা করে। কালিতে লেপ্টে গেছে। সবুজ চিৎকার করে ওঠে– বাবা!

পরভৃত

এক

প্রথম সন্তান প্রসব করার পরই অজ্ঞান হয়ে গেল বাদলের বউ দুলু। শীতকালের মেঘের মতোই থমথম করছে বাড়িটা। বউটাকে সবাই যে খুব ভালোবাসত– এমন নয়। কেউ কেউ অপছন্দও করত নানান কারণে। কিন্তু আসন্নমৃত্যু-সম্ভবা মেয়েটার প্রতি সহজাত একটা করুণা জাগছে সবার মনেই। বিশেষ করে বাচ্চাটার জন্যে। ছেলে হয়েছে। কেমন নাদুস নুদুস। চাঁদের মতো ফুটফুটে। সুন্দর। চোখ জুড়িয়ে যায়। বউটা মারা গেলে বাচ্চাটাও হয়ত বাঁচবে না। এটাই শাশুড়ির ভয়। নয়ত বউয়ের জন্য অতটা দরদ নেই।

যেন সবাই নিশ্চিত জেনে গেছে– এখনই বউটা মারা যাবে; আর ওদের কাঁদতে হবে। এটা নিছক লোক দেখানো শোক নয়; বাস্তবিকই সবার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। শুধু একজনের নয়। দুলুর স্বামী বাদলের। বাদলের মন এখন ঘড়ির পেন্ডুলাম। বউটা মারা যাবে এজন্য কষ্টও হয়। আবার ভালোও লাগছে। কারণ, সে কোনোদিন বউকে ভালোবাসে নি। বিশেষ করে বাচ্চাটার দিকে তাকাতে পারে না বাদল। ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে শরীর, মন। বাদল ভাবছে। ভাবছে, বরং মরুক বউটা। তাহলে বাচ্চাটাও মারা যাবে। সে-ই ভালো। ও বাচ্চা সে সহ্য করতে পারবে না। ভূমিষ্ঠ হবার পর সব বাচ্চাই কাঁদে। অথচ এটা কাঁদছেও না। দাই পা দু'টো ওপরের দিকে তুলে মাথা নিচের দিকে করে দু'গালে কষিয়ে দিল দুই থাপ্পর। আর অমনি কাঁদল। বেক্কল বাচ্চা।

শীতের সকাল। দিনের প্রথম রোদ এসে পড়েছে কেবল উঠোনে। সেও মনে হয় বেরুলো মায়ের পেটের অন্ধকার চিরে। রোদটা তার ভালো লাগল না। অস্থির বাদল তবু চাদর গায়ে একটা চৌকি টেনে বসল এসে বাইরে। সে ভাবছে– কী আশ্চর্য পৃথিবী! সবাই জানে ছেলে বাদলের। কিন্তু বাদল তো নিশ্চিত জানে, ও ছেলের বাপ সে নয়। অন্য যে কেউ। বাপ হওয়া তো দূরের কথা, বউকে কখনও ছুঁয়েও দেখে নি বাদল। গল্পে শুনেছে বটে, দেবীরা কোনো দেবতাকে কামনা করলে সেই দেবতার জ্যোতিই দেবীর গর্ভ সঞ্চারের কারণ হতো। কিন্তু বাদল নিজে তো দেবতাও নয়। আর তার বউও দেবী নয়। অতএব, দুলু যে কুলটা এটা নিশ্চিত। অথচ মুখ ফুটে বাদল বলতেও পারছে না কাউকে– ও ছেলে তার নয়। বিশ্বাস করবে কে? বাসর রাত থেকেই যে তার ঘর করছে; থেকেছে একই সাথে? কত রাত কেঁদেছে দুলু। কিন্তু পাশটি ফিরেও শোয় নি বাদল। মাঝখান থেকে সে বাপ হয়ে গেল? রেডিমেট বাপ! এ যন্ত্রণাটাই তাঁকে খোঁচাচ্ছে বারবার।

মেয়েটা যে দুশ্চরিত্র, তা বোঝা গিয়েছিল বিয়ের রাতেই। শুভ দৃষ্টির সময় ফিক্ করে দিয়েছিল হেসে। প্রথম প্রণাম করার সময়ই পায়ে কেটেছিল বিরাট এক রাম চিমটি। হঠাৎ পা-টা টান মারতেই কয়েকজন বলে উঠেছিল– কী হয়েছেরে? কী বলবে ভেবে না পেয়ে বাদল বলেছিল– পিঁপড়েয় কামড়িয়েছে। যখন দেখাশোনা চলছিল, তখনও অবশ্য দু'পাঁচ কথা শুনেছিল মেয়ের সতীপনা নিয়ে। তা ধোপে টেকে নি। যৌতুকের পাল্লাটা বেশ ভারি ছিল। মেয়েটা যে খুব পছন্দ হয়েছিল তা নয়। বাবা-মা যখন ঠিক করেছে; আর তাছাড়া কিছু দেবে-থোবেও– এ কারণেই শেষ পর্যন্ত রাজি হওয়া। বিয়ের রাতেই সেই হেসে ওঠা, আর রাম চিমটি যেন শ্রুত অসতীত্বে আরও একটু কলঙ্ক লেপে দিল। বাসর রাতে বউয়ের সাথে বিশেষ একটা কথাও বলল না সে। পাশে শুয়ে তার গা টা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। দুলুকে সে ছুঁয়েও দেখল না।

বাসর রাতেই দুলু কাঁদল। বলতে গেলে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বাদলের বিয়ে করা। তারপর শ্বশুরও রাখে নি তার কথা। বিয়ের সময় কিছু দিয়ে, বাকি যা যা দেয়ার কথা ছিল, তা যেন বেমালুম ভুলে গেছেন। রাগটা বাদলের ভেতরে। বাইরে সে যোগ্য স্বামী। বউয়ের সাথে মেলে মেশে; স্বাভাবিক আচরণ করে। ঝগড়াঝাটি করে না। তবে বিয়ের পর একটু বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে বাদল। বাবা-মা ভাবছে– বিয়ে হয়েছে, এখন তো একটু ভার-বুদ্ধি হবেই। বাদল আর দুলুর মধ্যে কিন্তু ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে গেল কাচের দেয়াল। তা বুঝল না আর কেউ।

বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেও বাদলের মন পায় নি দুলু। দিন দিন শাশুড়িও তার হয়ে উঠেছে বৈরী। বছরখানেক কেটে গেল। মা হবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন মরে তীব্র তৃষ্ণা হয়ে ওঠে। অন্যের চোখে সে বন্ধ্যা নারী। আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে পাঁচকথা হয়। সে বাঁজা। যে কোনো ছলছুতোয় আত্মীয় স্বজন খোটা দেয়। যে কোনো

মুহূর্তে তার ঘুচে যেতে পারে এ সংসারের অন্যজল। সে মরীয়া হয়ে ওঠে। মা হবার বাসনা তাকে কাঠ ঠোকরার মতো দিন রাত ঠোকে। বুকে তার মাতৃচেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। যে করে হোক, তার মা হওয়া চাই-ই। তার সন্তান চাই। হাল ছেড়ে দিয়ে এক সময় সে পা বাড়ায় অন্যপথে।

মা হবার এক তীব্র বাসনা তাকে বিহ্বল করে দেয়। সন্তানের কথা ভাবতেই তার দেহে ও মনে গোপন পুলক খেলে যায়। কল্পনায় পেটে তার সন্তানের অস্তিত্ব অনুভব করে। পুলকিত হয়, রোমাঞ্চিত হয়। পাশের বাড়ির বিন্দু বৌদি ছাড়া তার কষ্টের কথা জানে না আর কেউ। এ অভিনব যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি চায়। সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক, মা সে হবেই। মাতৃত্বের অধিকার নিয়েই সে থাকবে এ সংসারে। প্রয়োজনে ছলনার আশ্রয় নেবে সে, কুপথে পা বাড়াবে, অন্যের শয্যাসঙ্গী হবে; যে কোনো ভাবেই হোক– মা হওয়া তার চাই। মরীয়া হয়ে ওঠে দুলু।

কাছেই বিন্দু বৌদির বাড়ি। বিধবা। তবে বেশ রসের। দেখা হলে দু'একটা রসের কথা বলে। আড়চোখে মৃদু হেসে দু'একটা অশ্লীল বাক্যও ছুঁড়ে দেয় মাঝে সাজে। তাতে জ্বলন্ত অঙ্গারে এক ফোঁটা জলের মতো ছ্যাঁৎ করে ওঠে ভেতরটা। বাদল ভাব জমিয়ে ফেলে। খাঁ খাঁ মরুতে যেন কচি একটা লতা হাওয়ায় দোলে। বাদল খেয়াল করেছে– নির্জনে কথা বলার সময় বিন্দুর বুকের আঁচল আনমনে খসে পড়ে। তাড়াতাড়ি তুলতে চেষ্টা করত প্রথম প্রথম। এখন আর সে ব্যস্ততা নেই। সময়-অসময়ে বাদল বিন্দুর বাড়ি যায়।

বিন্দুর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। হাসতে হাসতে একদিন বিন্দু ঢলে পড়ে বাদলের গায়। বাদল শিহরিত হয়। বিন্দুকে বুঝতে পারে না। কী মনে হয়– আলতো করে হাত রাখে বিন্দুর পিঠে। হাত সরিয়ে দিল না বিন্দু। সলজ্জ হেসে আড়চোখে চেয়ে বলল– 'ওমা, নিজের বউ থাকতে এ আবার কী শখ?'

দ্রুত হাত সরিয়ে নিল বাদল। বলল– 'বিশ্বাস কর বৌদি, দুলুরে আমি সহ্য করতে পারি না। ও দুশ্চরিত্রা।'

– ওমা, তাইলে কি আরেক জনরে সোহাগ করবা? ভালোবাসবা আরেকজনার বউরে? তুমিও তো দুশ্চরিত্র।

– দুলুকে আমার ছুঁতেই ঘেন্না হয়। তারে আমি...

দুই

সকালের রোদে বসে বাদলের স্মৃতির রোমন্থন। চারদিকে কুয়াশা। ঘন। তার ভেতর আনকোরা সকালের রোদ। সে ভাবছে– সেও যেমন ডুবে ডুবে জল খেয়েছে, বউও তেমনি। সেয়ানে সেয়ানে। কিন্তু, তারপরও বউয়ের বিষয়টা মেনে নিতে তার কষ্ট হয়। শত হলেও সে মেয়ে মানুষ। বাদল পুরুষ মানুষ। পুরুষের একটু আধটু দোষ থাকতেই পারে। তাছাড়া বিন্দু বৌদি বিধবা। তখনই মনে হয়– স্বামী থাকতেও তো দুলু বিধবা। একথা মনে হতেই মনটা একটু নরম হয়ে পড়ে। ভাবে– বেচারির দোষ কী? তবুও মন থেকে পারছে না তাড়াতে সন্দেহের ভূত। পারছে না মেনে নিতে। এক একবার ভাবে– ছেলেটার দোষ কী? কী পরিচয় নিয়ে বাঁচবে সে? তার চেয়ে নিজের বলে চালিয়ে দিই। আদর করি। ভালোবাসি। কিন্তু, কোথায় যেন তবু খটকা লাগে। কণ্ঠে বিঁধে থাকে সূক্ষ্ম এক কাঁটা। মনকে অতিক্রম করতে পারে না মন। বুকের ভেতর খোঁচা মারে। ছলকে ওঠে রক্ত। চিন্ চিন্ করে।

প্রথম যখন টের পেল, দপ্ করে জ্বলে উঠল বাদল। ছুটে গেল দুলুর কাছে। এর একটা বিহিত না করে সে ছাড়বে না। কিন্তু কী ভাবে বলবে কথাটা, তা ভেবে পেল না। কী বলবে, তাও বুঝতে পারল না। ভাবল– এখন থাক, পরে বলব। এমন করে করে বলাই হলো না। বউ কি তার ভেতরের খবরটা টের পেয়ে মুচকি একটু হাসল? তাও বোঝা গেল না। তবে দু'জনের দূরত্বটা গেল আরও একটু বেড়ে।

ভাবনার এক ঊর্ণজালে আটকে পড়ে বাদল। ঘুরপাক খায়। বেরুতে পারে না। দুশ্চিন্তা তার নিত্যসঙ্গী। সারাক্ষণ একই ভাবনা– কাকের বাসায় কোকিলের ডিম। না, কেউটের। বউয়ের পেটে তার কেউটের বাচ্চা। ক্রমশ বাড়ছে এক বিষধর সরীসৃপ। নিঃশ্বাসে তার বাতাস বিষাক্ত। যন্ত্রণায় নীল হতে থাকে বাদল। কোনো সমাধান মেলে না। দিশা না পেয়ে ছুটে যায় গ্রামের ডাক্তার শফিকের কাছে। চেপে ধরল তাকে– 'যে কোনো ভাবে নষ্ট করে দাও; ওটা আমার না।' শফিক অবাক– বাদলের বউয়ের বাচ্চা বাদলের নয়? এ কী হতচ্ছাড়া কাণ্ড! ভেবে পায় না কী করবে? পেড়াপেড়িতে অবশেষে রাজি হয় বাদলের প্রস্তাবে।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন গত হয়; কাজটা কিন্তু করে না শফিক। বাদলের অহরহ তাড়া ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় না শফিকের। তার মন সরে না বাদলের কাজে। অন্যায় মনে হয়। তাছাড়া বউটার জীবন নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এ সময় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ভেতরে কেমন এক পাপ বোধ জাগে শফিকের। সে তার অপারগতা জানিয়ে দেয়। এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে এক রকম হতাশ হয়েই পড়ে বাদল। অপেক্ষা করতে থাকে সেই পরম এবং চরম দিনটার জন্য। ভয় পাওয়া রোগীর মতো সারাক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে থাকল এ চিন্তা। অথৈ জলে ভাসা ছোট্ট একটু খড়কুটো মনে হয় নিজেকে; কোনো কিনার পায় না। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না বাদলের।

আজ সেই দিন। কাঙ্ক্ষিত অনাকাঙ্ক্ষিত দিন। তার বউয়ের বাচ্চার জন্মদিন। জারজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার দিন। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম ফোটার দিন। অজস্র বিক্ষিপ্ত চিন্তা। উদ্বিড়ালের মতো বাদলের মাথায় ডিগবাজি খায়। কী করা? সে ভাবছে। শুরু এবং শেষহীন ভাবনা। ভাবনা তার রেশমগুটি। জট খোলে না।

চোখ গেল বাড়ির কোণায়। খড়ের মাচানের নিচে। কয়েকটা বাচ্চা নিয়ে কেঁউ কেঁউ করছে কুকুরটা। দু'একদিন আগেই বাচ্চা দিয়েছে। আশেপাশেই ঘুরঘুর করছে কুকুরটা। সেও আদর করছে বাচ্চাগুলোকে। কুকুরটা তাদের পালিত। কোথা থেকে যেন কুকুরিটা এসে জুটেছে বেশ কিছুদিন হলো। বাদলের মনে পড়ে– এই কুকুরিটাই তাদের কুকুরটাকে পাত্তা দিত না বর্ষাকালের শেষ দিকে। যখনই রাস্তায় যেত, তখনই অন্য দু'টো কুকুর কামড়িয়ে খোঁড়া করে দিত। কুকুরিটাও কামড়াত। অনেক কামড় সহ্য করেও কুকুরটা আবার রাস্তায় যেত। কুকুরিটা তাকে পাত্তা দেয় নি কোনোদিন। আশ্চর্যের ব্যাপার– বাচ্চা দেয়ার সময় হলে সেই কুকুরিটাই এসে আশ্রয় নিল ওদের বাড়িতে। ওদের কুকুরটাও যেন এতে মহাখুশি। আদর করছে– ও গুলো যেন নিজের বাচ্চা। কুকুরটাকে বাদল বেক্কল বলে গালি দিল। 'শালা, কী হ্যাংলা?' পরের বাচ্চার প্রতি মমতা দেখে তার রাগ হলো।

ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো পেল হাতের কাছেই। মারল ছুঁড়ে। লাগল গিয়ে কুকুরিটার গায়ে। খেঁউ করে উঠল। কুকুরটা চোখ পাকিয়ে, দাঁত কড়মড় করে তার মনিবকে শাসাল ঘেউ ঘেউ করে। তার মনে হলো কুকুরের মাথায় বুদ্ধি কম। শালা, কী বোকা? বোকা না হলে পরের বাচ্চা এ ভাবে আদর করে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা মনে হলো। সে-ই-বা কুকুরের চেয়ে কম কী? আশ্চর্য এক মিল খুঁজে পাচ্ছে সে কুকুর আর নিজের মধ্যে। একটু নড়েচড়ে বসে বাদল।

শুধু তার মধ্যেই নয়। মানুষ আর কুকুরের মধ্যে সে মিল খুঁজে পায়। ক'জনেরইবা জন্মের ঠিক আছে? যে সন্তান হলো, তা যে স্ত্রীর স্বামীর– তার প্রমাণ কী? এ সংসারে কুকুর হয়ে বাঁচাই বরং ভালো। কত সহজেই ওরা মেনে নিতে পারে! কত কমেতেই ওরা তুষ্ট! মান অভিমান রাগ অনুরাগ দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাা কিছুই নাই ওদের। কিন্তু দুলুর ছেলের কথা মনে হতেই বিষিয়ে ওঠে মন। দুর্বিষহ এক সংঘাত এবং যন্ত্রণা দাপাদাপি করে মনের মধ্যে। ভাবে– 'কুকুর তো বোঝে না। কিন্তু আমি যে বুঝি? আর জানি, ও ছেলে আমার নয়। এরপরেও কী করে মেনে নেই?'

এমন সময় একটা কাপড়ের পুঁটলি কোলে তার কাছে এসে হাজির বিন্দু বৌদি– 'নেও, ছাওয়াল কোলে নেও।' ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতেই গা জ্বলে উঠল বাদলের। মনে হয় তার চোখে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল কেউ। কেমন ঘুমে জড়ানো চোখে পিট পিট করে তাকায়। খোলে খোলে ভাব করে, আবার খোলেও না। কেমন ইন্দুরের বাচ্চার মতো দেখতে। বাদল তার বাপ নয় বলে তাকাতেও মনে হয় বাধে। শালা জমিদার পুত্তুর! ঘেন্না হলো বাদলের। ভাবে– সে ছোঁবেও না ওই ইন্দুরের বাচ্চা। সে তো আর কুকুরের মতো নির্বোধ নয়। বলে– 'তুমি তো জানো বৌদি, ও ছাওয়াল আমার না। ও জারজ সন্তান আমি ছোঁব না।'

ম্লান হেসে বিন্দু বলল– 'সন্তান কি জারজ অয়? এ তোমারই ছাওয়াল। দ্যাখছো না, নাকটা ক্যামোন তোমার মতোই?' চমকে ওঠে বাদল। সত্যিই তো, তার সাথে কোথায় যেন এক আশ্চর্য মিল রয়েছে বাচ্চাটার। ভালো করে দেখে বাচ্চাটাকে। ঠিক যেন তারই মতো। চোখ, মুখ, নাক, কপালটা। আবার ভাবে– ধ্যাৎ, সব বাচ্চাই, দেখতে একই রকম। কুত্তার বাচ্চা, ইন্দুরের বাচ্চা, কোনটার থেকে কোনটা আলাদা করা যায়? জন্মের পরপর সব শিশুই একই রকম। আলাদা কোনো চেহারা থাকে না। বাদল নিশ্চিত হয়ে গেল– এ ছেলে তার নয়। বলল– 'তাইলেও আমি তো জানি, ও ছাওয়াল আমার না।' বিন্দু– 'আর আমিও তো জানি, এ ছাওয়াল

তোমারই। বিন্দু মোটেই অসতী না। আর তোমার বউদিরেইবা অত খারাপ ভাবছো ক্যান? মনে আছে যে কয়দিন তুমি আমার কাছে গেছিলা, সে কয়দিন আগে থিকাই দুলু বাপের বাড়ি গেছিলো?'
বাদল যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্ময়ে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে অস্ফুটে বলে ওঠে– 'বলো কী বৌদি? দুলু ...'। মনে পড়ে সে দিনগুলোর কথা। দুলুকে বেশ উচ্ছল মনে হতো তখন। তাতে তার খুব ঈর্ষা হতো। রাগ হতো। শরীরের টানেই চলে যেতো বিন্দুর কাছে। তাহলে কি ...? কী এক আনন্দ খেলে যায় দেহে ও মনে। সে বাবা হয়েছে। ও ছেলে তার। বেলুনের মতো হালকা হয়ে যায় বাদল। তার উড়তে ইচ্ছে করছে। নাচতে ইচ্ছে করছে। এ যে দারুণ অসম্ভব। তাই ঘটেছে। আর স্থির থাকতে পারছে না সে। মনের অজান্তেই হাত জোড়া এগিয়ে যায় সামনের দিকে। বিন্দু বলে ওঠে– 'থাক, এ যহোন তোমার ছাওয়ালই না; তহোন পরের ছাওয়াল কোলে নিয়াইবা কী লাভ?' এক পাক ঘুরে ছেলেটাকে নিয়ে ফিরে চলল বিন্দু। এ কোন তামাশা? এ হেঁয়ালির কোনো মানেই বুঝল না বাদল। কিন্তু দুলুর জন্য মনটা কেমন ছটফট করে উঠল। কেন যেন মনে হয় দুলুর জ্ঞান ফিরুক। দুলু যেন বেঁচে যায়। যেন না মরে। বাচ্চা ছাই যারই হোক, সে নিজের বলেই চালিয়ে দেবে। এই প্রথম দুলুর জন্য তার মনটা হু হু করে উঠল। গ্রীষ্মের শুকনো নদী হয়েছিল যে ভালোবাসা, আজ তা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে দু'কূল ছাপানো বর্ষার বন্যা। এই প্রথম বাদলের মনে হলো তার ভালোবাসা জমাট বরফ হয়েছিল দুলুর জন্য। দুলু শুধু তারই। আবার সে সুখের ঘর বাঁধবে। একটা কুকুর যদি পারে, সে পারবে না কেন? কুকুরের চেয়ে তো সে অধম নয়? তীব্র এক আনন্দ মেশানো উত্তেজনা বাদলকে পাগল করে তোলে।

তিন

এ সময় আতুর ঘর থেকে ভেসে আসে কান্নার ধ্বনি– 'এ তুই কী করলি বৌমা? আমাগো ফাঁকি দিয়া চইল্যা গেলি। সোনার টুকরা . . . মাগো . . . শত্তুর . . . তোর কোলের মানিক . . . ' ডুকরে কাঁদছে বাদলের মা। বাদল পাথরের মতো স্থির। তার পা দু'টো যেন আটকে গেছে মাটিতে। পৃথিবীর সমস্ত স্পন্দন যেন থেমে গেছে। তির্ তির্ ঝর্ণার মতো শুধু চলছে একটা মিহি কান্নার ধারা। দৃষ্টি তার খড়ের মাচানের তলে গিয়ে স্থির হয়ে আলপিনের মতো আটকে থাকল– কুকুরির একটা বাচ্চাকে আদর করছে কুকুরটা। কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদটা কখন যেন তীব্র প্রখর হয়ে উঠেছে।

প্রহর

পাকিস্তানি পাতাকাটা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল বাড়ৈ বাড়ির সুখচাঁদ। পাতাকা টাঙানোর বাঁশটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাঠে, এমনভাবে যে মনে হলো শ্মশানে মড়া পোড়ানো শেষের অপ্রয়োজনীয় বাঁশ ওটা। সবচেয়ে ছোট বলে অজয় ছিল লাইনের প্রথমে। মাত্র সাত বছর। ক্লাস ওয়ান। স্কুল শুরুর আগে একে অন্যের কাঁধে হাত রেখে জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো 'পাক সার জমিন সাদ বাদ ... পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, পুরব বাংলা শ্যামলী মায় ... ।' অজয় সবার সামনে বলে তার হাত নিচেই থাকত; কারো কাঁধে রাখার প্রয়োজন হতো না। স্কুল শুরুর আগের এই ব্যাপারটা তার ভালোই লাগত। কিন্তু ওইদিন হঠাৎ কী হলো ক্লাস ফোরের ধাড়ি ছেলেটা, যে নাকি বারবার ফেল করে এবং যার হাত-পায়ের লোম বড় বড়, বড় মানুষদের মতো এবং যার সবে মোচ গজিয়েছে, সেই সুখচাঁদ হঠাৎ কোথা থেকে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাঁশটা ধরে, পতাকাটা নামিয়ে ঝটকা টানে পুরনো ন্যাকড়ার মতো ফড়ফড় ছিঁড়ে ফেলল এবং সবাইকে তাড়িয়ে দিল। শ্লোগান ধরল– 'পাকিস্তান, নিপাত যাক; পাকিস্তান, নিপাত যাক।' শিকলের মতো লাইনটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মুহূর্তে। তবে সেদিন থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বলাবলি করছিল যুদ্ধ লেগেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেক লোক জড়ো হয়েছিল বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। মদনকাকার ধনুকের মতো বাঁকা তালগাছটায় উঠে অনেকে দেখছিল এদেশের মাটিতে প্রথম জ্বলে ওঠা এরকম আগুনের লেলিহান শিখা। বোলতলি বাজার ওখান থেকে পাঁচ/ছয় মাইল। জ্বলছে পুরোটা। আকাশ ছুঁতে চায় কুণ্ডলায়িত ধোঁয়া। তার উত্তাপ এবং অভিশাপ যেন তাদের ছোঁয়। আনন্দগুলো ইঁদুর ছানা হয়ে গর্তে সেঁধিয়ে যায়; কপালে রেখে যায় দুশ্চিন্তার বালুচরি ভাঁজ। রাত বাড়ে। আগুনের রঙ মেখে চোখে বিছানায় যায় মানুষ। রাতে শুয়ে অজয় প্রশ্ন করে– বাবা, যুদ্ধ কী?

অজয়-সুজয় দু'ভাইকে মাঝখানে রেখে দু'পাশে বাবা আর মা শোয়। এক বছরের ছোট সুজয় বলে ওঠে– হেঁ, যুদ্ধ চেনে না, যুদ্ধ অইলো গিয়া খেলা। বাবা চুপ মেরে থাকে। অজয় আবার বলে–

– বাবা, পাতাকাডা ছেঁড়লো ক্যান?

– ওডার আর দরকার নাই; হেই জন্যে।

– বাবা, বাজারে আগুন দেছে ক্যান?

– এ্যাহোন গুমাও বাবা, কাইল কবোনে।

রাত পোহালে এলাকার তরুণ সংঘের কয়েকজন যুবক গেল বোলতলি বাজার দেখতে। গোবিন্দ, শফিক, ভবসিন্ধু, রমেশ আর সুশীল বোলতলি থেকে ফেরার পথে মেশিনগানের গুলির নিচে পড়ল। কাৎ হয়ে শুয়ে রাস্তা থেকে গড়িয়ে পড়ল নিচে, খালের ভেতর। আর ভেসে উঠল না। রক্তে লাল হয়ে গেল জল। নাক জাগিয়ে পড়ে থাকল মড়ার মতো। মিলিটারি ফিরে গেলে ওরা বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে। গোবিন্দর বাম হাতের কনুইয়ে এবং সুশীলের ডান হাঁটুতে লেগেছে গুলি। ওরা উঠতে গিয়ে টের পেল সুশীল হাঁটতে পারছে না। তার ডান পা অচল। কাঁধে ধরাধরি করে সন্ধের দিকে তারা রক্ত-মাখা পাঁচ জন গ্রামে ফিরল। পুলপার বটতলা দোকান ঘরের কাছে এসে দোকানের বেঞ্চিতে লম্বা করে শুইয়ে দিল সুশীলকে। পা থেকে রক্ত ঝরছে তখনও। হাঁটুতে আটকে রয়েছে গুলি। ধারাল ছুরি হ্যারিকেনের আগুনে পুড়িয়ে হরিপদ ডাক্তার সুশীলের হাঁটু খুঁচে খুঁচে বের করে আনল পাকিস্তানি মেশিনগানের গুলি। শত শত লোক জড়ো হয়ে গেল মুহূর্তে। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত-নীরব। এত লোক অথচ কোনো শব্দ নেই। যেন সব পাথরের মূর্তি। শ্মশানের নিস্তব্ধতা। রক্ত মাখানো গুলিটা দোকানির কাঁসার থালায় রাখল ডাক্তার। ছোট্ট একটা ঠুন্ শব্দ হলো। অথচ শব্দটা যেন ছোট্ট নয়; ভয়ানক, বিকট এক আর্তনাদ। গুলির স্পর্শ পেয়ে কাঁসার থালাটা যেন চিৎকার করে উঠল। শব্দ আতঙ্ক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রত্যেকটা হৃৎপিণ্ডে। শব্দটা শেষ হলো না; গেঁথে থাকল প্রত্যেকের বুকে।

পরদিন সাতপাড় বাজারের শিবু পোদ্দারের মুদির দোকানে আগুন দেবার আগে মিলিটারিদের শখ হলো শিবুকে কেরোসিনে স্নান করানোর। শিবুর দোকানে হাতের কাছেই পাওয়া গেল কেরোসিনের টিন। টিন ধরে উপুড় করে দিল শিবুর মাথায়। তারপর ফজর আলি মেম্বার বলল– 'দে দৌড় হালার মালাউনের পুত। বাঁচতি চালি পালা।' পা দু'টো ভারি দু'মণই দু'টো পাথর, তবু শিবুর সে কী খরগোশ দৌড়! কিন্তু শিবু তখনও জানে না, ম্যাচকাঠি জ্বলে উঠেছে পেছনে। ছুঁড়ে দিয়েছে তার দিকে। টের পেল তখন, যখন আতশবাজি হয়ে জ্বলে উঠেছে শিবু। উদ্ভ্রান্ত ছুটছে একজন অগ্নিমানব। সে এক দৃশ্য বটে! গায়ের গেঞ্জি, লুঙ্গি সব দৌড়তে দৌড়তে খুলে ফেলছে শিবু। কিন্তু আগুন নেভে না। তৃষ্ণার্ত জিভে কেরোসিন চেটে ততক্ষণে চর্বির স্বাদ পেয়েছে আগুন। শিবু দৌড়য় ... আগুন দৌড়য় ... পুকুর খোঁজে ... তার চামড়া পুড়ে সাদা; চামড়া পোড়া গন্ধ দৌড়য় ... শিবুর চিৎকার দৌড়য় ... । এক সময় আধপোড়া আস্ত মানুষের রোস্ট হয়ে শিবু পড়ে থাকে রাস্তার ধারে; বাতাসে তার গন্ধ ভাসে। তখনও রোস্ট হয় নি যারা, নাকে কাপড় চাপা দিয়ে তারা দেখে শিবু মুদির রোস্ট।

অজয়ের বাবা অনিল সে দৃশ্য দেখে ফিরে এসে রাতে আর খেতে পারে না। নাকে লেগে রয়েছে শিবু মুদির রোস্টের গন্ধ। বমি আসে; ওক আসে। অজয় একটু একটু বুঝতে পারে– এই-ই বুঝি যুদ্ধ। চোখ বুঁজলেই সে শিবু পোদ্দারের রোস্ট দেখে। দেখে, শিবু দৌড়ায় জ্বলন্ত মানুষ। মাঝে মাঝে ভয় হয়– হয়ত শিবু নয়; তার বাবা। বাবা নয়ত?

– বাবা, মাইনসে মাইনসেরে মারে ক্যান?

– মাইনসে মাইনসেরে মারে না বাবা; পশুতে মাইনসেরে মারে।

– বাবা, আমাগো বাড়িতেও কি আগুন দেবে?

বাবা কথা বলে না। প্রেতপুরীর মতো নিস্তব্ধ গ্রাম। সারা গ্রাম মনে হয় ঘুমন্ত। কিন্তু কারো চোখে ঘুম নেই। রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে চোখ থেকে। ভোরবেলা সূর্য ওঠে– আলো নয়, আগুন হয়ে; আতঙ্ক হয়ে; আতঙ্ক নিয়ে। এখানে ওখানে জ্বলে ওঠে বাড়ি। মানুষ পালায়। প্রাণভয়ে ছুটে যায় বিলের দিকে। দিনে পালিয়ে থাকে; রাতে ফিরে আসে ঘরে। সূর্যোদয়ের আগে ঘর ছাড়ে; ঘরে ফেরে সূর্যাস্তের পর। প্রতিদিন বাড়ি পোড়ে, ঘর পোড়ে, মানুষ পোড়ে। গুলিবিদ্ধ হয় মানুষ। স্বপ্নপোড়া মানুষেরা চিরকেলে বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে পালায়। প্রতিরাতে প্রত্যেক বাড়ির কোনো না কোনো একটি পরিবার পাড়ি জমায় ভারতের উদ্দেশ্যে। অজয়দের বাড়ির অর্ধেক খালি। কিছুতেই ভারতে যেতে চায় না অনিল। যেতে চাইলেও সম্ভব নয় যাওয়া। অজয়-সুজয় নাদুস-নুদুস দুই ভাই আদরে বড় হয়েছে। অত পথ হাঁটতে পারবে না। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভালো থাকায় কাঁধে বা কোলে করেও তাদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাতে হয়ত বেঘোরেই প্রাণটা যাবে। তার চেয়ে দেশের মাটিতেই মরা ভালো। তাই ভারতে যাবার পরিকল্পনা বাতিল হয়।

কিন্তু অজয়-সুজয় দু'ভাইকে নিয়ে বিলের জলে পালিয়ে বাঁচাও সম্ভব নয়। দু'দিন বউ বাচ্চা নিয়ে অনিল পালাতে গেছিল বলবাড়ির পাথারে। গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে কচুরির মধ্যে নাক জাগিয়ে পুরো দিন বসে থাকাটা খুবই কষ্টের। তারপর কখনও ঢোড়া সাপ চলে যায় গায়ের উপর দিয়ে; কখনও জোঁক লাগে গায়ে। আর অজয়-সুজয় চিৎকার দিয়ে ওঠে। তাতে অন্যরা খেপে যায়। শত শত কালো কালো মাথা জলের উপর কচুরির মধ্যে দেখা যায় বল বাড়ির পাথারে। সারাদিন জলের মধ্যে থাকায় ঠাণ্ডা লেগে দু'জনের দু'দিনেই কাশি হয়ে গেছে। অনিল ভেবে কোনো কিনারা করতে পারে না।

বুদ্ধিটা অবশ্য অনিলের বউ নির্মলার মাথা থেকেই বেরয়–

– হোনো, আমি এ্যাট্টা কতা ভাবছি, ঘরামিগো আর বাড়ৈগো এই দুই পুকুরের মইদ্দেহানে যে জঙ্গল, বিরাট বেতের ঝোপ; তার মইদ্দে থাকতে পারে না অজয় আর সুজয়?

– কীভাবে থাকবে? ভয় করবে না?

– বেতের ঝোপের মইদ্দে বাঁশের মাচান বানাইয়া, তার উপার এট্টা কাঠের বাক্স বানাইয়া দিলে অরা থাকতে পারে না?

– শেয়াল, বাগডাসা, খাটাশের ভয় পাবে না? তাছাড়া সাপখোপ আছে। হায়েনা আছে।

– তক্তা দিয়া এ্যাট্টা বাক্স কইর‍্যা দ্যাও। বেইল ওঠোনের আগেই অগো দুইজনরে বাক্সের মইদ্দে রাইখ্যা তালা মাইরা যাবো। সইন্ধ্যার পর তালা খুইল্যা নিয়া আসবো।

– ক্ষিধা লাগলে খাবে কী?

– কৌটা ভইর‍্যা চিড়া আর গুড় রাইখ্যা যাবো। আর এক কলস জল।

– পায়খানা-পেচ্ছাব পাইলে কী করবে?

– নিচের এ্যাট্টা তক্তা আলগা রাখবা। পায়খানা-পেচ্ছাব পাইলে তক্তাখান উঠাইয়া করবে। আর পাশের তক্তা গুলান সামান্য এট্টু ফাঁক ফাঁক কইর‍্যা লাগাবা যাতে গরমে মইর‍্যা না যায়।

অজয় আর সুজয়ের সারাদিনের গা ঢাকা দেবার জায়গাটা এমনই নিরাপদ হয়েছে যে বেতের ঝোপ কেটে পরিষ্কার না করলে তাদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যাবে না। সকালে বাক্সের মধ্যে দু'জনকে ভরে তালা বন্ধ করে বাবা-মা চলে যায় বলবাড়ির বিলে; সন্ধের পরে ফিরে তালা খুলে বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে দিনেও সেখানে শেয়াল ডাকে, দৌড়ে যায় বেজি; তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সাপের ফণা কিংবা একেবেঁকে চলে যাওয়া গোখরো। দু'ভাই জড়াজড়ি করে নিশ্চুপ পড়ে থাকে সকাল থেকে সন্ধে। তাদের পৃথিবীতে আসে না কখনও উজ্জ্বল দিন। এভাবেই কেটে যায় একেকটা প্রহর।

দুই তক্তার মাঝখানে সাপ ঢোকার মতো ফাঁক নেই। কিন্তু যে সামান্য ফাঁক তা দিয়ে সাপের জিভ ঢুকে যায়। সেদিন দুপুরে হিস্ হিস্ সাপের জিভটা ভিতরে ঢুকে গেলে চিৎকার দিয়ে ওঠে দুই ভাই। কনুইয়ে বেঁধে উল্টে যায় জলের কলস। তেষ্টা পেলেও এক ফোঁটা জল পায় না খেতে। শুকনো চিড়ে আর গুঁড় তেষ্টা দেয় আরও বাড়িয়ে। অপেক্ষায় থাকে কখন সন্ধে হবে; কখন রাত নামবে; তখন বাবা এসে নিয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে জল খেতে পাবে। বাড়ি ফিরেই মা রান্না চড়ায় প্রতিদিন। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবে। চিন্তাগুলো কষ্ট হয়ে; কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসে চোখে। কালো কালো অশ্রুগুলো কালো অন্ধকারে মেশে।

পাকা জামের মতো সন্ধেটা ফিকে থেকে আরও গাঢ় হয়। গাঢ় অন্ধকার আঠালো আলকাতরার মতো লেগে থাকে চারপাশ। সেই ঘন দুর্ভেদ্য দেয়ালে নিয়ত জ্বলা-নেভা জোনাকিদের ছোট ছোট ছিদ্রের মতো দেখায় ঝোপের ভেতর। হায়েনার চোখ জ্বলে ওঠে তক্তার ফাঁকে; শেয়াল ডেকে যায় চারপাশ ঘুরে। বাবা আসে না। পিপাসায় জিভ শুকিয়ে যায়। সাপে-বেজিতে যুদ্ধ; ফোঁস ফাঁস। ভয়ে বুকের রক্ত হিম। কথা বলে না। বাজপাখি কড়কড়ড়ড়ড়ড় ... করে ওঠে ... বাবা আসে না। মা আসে না। ওদের বিশ্বাস– বাবা আসবে ... মা আসবে ... রাত যতই হোক; বাড়ি ফিরিয়ে নেবেই তাদের। তৃষ্ণায় ... ভয়ে ... প্রতীক্ষায় ... প্রত্যাশায় ... ক্লান্তিতে ... ঢলে পড়ে দু'ভাই। রাত কত ... ওরা জানে না ... বিশ্বাস ... বাবা আসবে, মা আসবে ... শেয়াল আর ডাকবে না ... নিভে যাবে হায়েনার চোখ।

অজয়ের চোখে নেমে আসে হিমশীতল ঘুম। ভাইয়ের নিথর দেহ আঁকড়ে সে দেখতে পায় চারদিকের বেড়া, বাক্সের তক্তা গলিত মাংসের মতো খসে খসে পড়ে। মানুষের গন্ধ চোখে জ্বেলে, হিংস্র থাবা বিস্তার করে চারপাশ ঘিরে আছে শেয়াল আর হায়েনার দল। দাউ দাউ জ্বলছে তাদের ঘর। মানুষের রোস্টের গন্ধ নাকে এসে বিঁধে। দেখে, শিবু পোদ্দারের মতো গায়ে আগুন মেখে বাবা দৌড়ায়। মুণ্ডু নেই; শুধু ধড়।

আর্তনাদ

একটা শব্দ। না। শব্দ নয়। একটা চিৎকার। না। চিৎকার নয়। একটা আর্তনাদ। একটা নয়। অনেকগুলো আর্তনাদ। কতগুলো চাপা আর্তনাদ। গোঙানি। শাখালিনের ভূ-গর্ভস্থ আর্তনাদের মতো। চাপা। অস্পষ্ট। আর্তনাদ। হৃদয় বিদারক। রোজই প্রায় শোনা যায়। প্রায় রোজ। রাতে। রাত বারোটার পরে। ঘণ্টা দুই চলে। মাঝে মাঝে শোনা যায়। মাঝে মাঝে শোনা যায় না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন ভদ্রলোক।

ঘটনাটা ঘটে চলেছে পাশের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট মানে ছোটখাটো বাসা। যে ফ্ল্যাট বা ঘর থেকে চিৎকার আসে তার পাশে যে ঘরটা, তাতে থাকেন ভদ্রলোক। মধ্যবয়স্ক। অকৃতদার। তিনি একজন শিক্ষক। একটু বাতিক আছে। সন্দেহপ্রবণতা। যে কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়েই অযথা ভাবনা। যেমন– মাঝরাতে কুকুরের বাচ্চা কাঁদছে করুণ সুরে। তাঁর ভাবনা– কাঁদছে কেন? অশনি সঙ্কেত? নাকি ক্ষুধার জ্বালা? নাকি ... ? সামান্য কোনো শব্দ। হঠাৎ ভাবনা– এ শব্দ কেন? কীসের শব্দ? হেতু কী এর? রীতিমতো গবেষণা। প্রতিটা বিষয়েই গভীর উৎসুক, তারপর উৎকণ্ঠা এবং শঙ্কা।

মাঝরাতে, ভদ্রলোক প্রথম যেদিন শোনেন এ আর্তনাদ, সেদিন থেকেই প্রতিদিন রাতে; রাত বারো পেরুলেই কান খাড়া করে বসে থাকেন– সেই শব্দ শোনার প্রতীক্ষায়। যেন এই এক্ষুণি শুনবেন সেই কাঙ্ক্ষিত শব্দ। শেষে শোনা যায় এক সময়। অস্পষ্ট। আর্তনাদ। চাপা। ভূ-গর্ভস্থ। মাটির নিচ থেকে ভেসে আসা কোনো সভ্যতার আর্তনাদ। তাঁকে ব্যথিত করে। তাই তাঁর ঘুম হয় না। এরপর শব্দ থেমে গেলেও বন্ধ হয় না চোখের পাতা। তিনি ঘুমুতে পারেন না। জাগে রাত। আর রাতের সাথে তিনি। মাথার ভেতর দশ লক্ষ ঝিঁঝিঁর ডাক। নাম তাঁর অবনী। কেন যেন মনে হয়, ও তাঁর ভেতরের আর্তনাদ। আত্মার আর্তনাদ। চেতনার অন্তর্গত আর্তনাদ। রোজ রাতেই তিনি শোনেন। আর ভাবেন। ঘুমুতে পারেন না। কাউকে বলতেও পারেন না। শোনাটা যদি মিথ্যে হয় তাঁর। হতেও তো পারে? আমরা যা শুনি, তার সবই কি সত্যি? যা দেখি, সবই কি বাস্তব? না। সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে। তিনি ভাবেন– চোখ-কান প্রতারণা করে আমাদের সাথে। এমনও তো হতে পারে– ও আর্তনাদ পাশের ঘরে নয়, নিজের বুকের ভেতর? ভদ্রলোক তাই চুপ হয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়, কথা থাকে। রোজ রাতে, একই সময়ে, কেন এ আর্তনাদ? কেন? উন্মাদ হতে আর বেশি বাকি নেই ভদ্রলোকের।

তাই একদিন সাহস করে, পাশের ফ্ল্যাটের কাজের লোকটাকে জিজ্ঞেস করেই বসল– তোমাদের ঘরের এদিক থেকে রোজ রাতে, কীসের একটা আর্তনাদ ভেসে আসে? চাকরটা অস্বীকার করল। সে বলল যে তারা তো কিছুই জানো না এ সবের? তিনি হয়ত ভুল শুনে থাকবেন। অবনীবাবু আর কথা বাড়ালেন না এরপর। নিজের উন্মাদতা সম্বন্ধে সচেতন হলেন। কেন যেন মনে হলো, সত্যিই খারাপ হতে চলেছে তার মাথাটা। তাই বাসায়, ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন। এবারে শব্দ নয়। আর্তনাদ নয়। নিজের সম্বন্ধে।

ভদ্রলোক ভাবছেন। বিষয়: আর্তনাদ। আত্মার অন্তর্গত আর্তনাদ। আর্তনাদ আসলে কী? কেন হয়? অন্তরের কষ্টটাই কি আর্তনাদ হয়ে বেরিয়ে আসে? নিঃসঙ্গতার নৈঃশব্দে কি তা প্রকট হয়ে ওঠে? তাহলে কি তিনি ভুল শুনেছেন? রাত বাড়ছে ক্রমশঃ। তিনি ভাবছেন। যথাসময়ে আবার সেই আর্তনাদ। তবে আরও চাপা। আরও অস্পষ্ট। তাঁর ভয় ভয় করতে লাগল। এ কি কোনো ভৌতিক ব্যাপার? কিন্তু আজ এত চাপা কেন? তাহলে কি ওই চাকরের সাথে এ শব্দের কোনো যোগ আছে? না হলে আজ কেন শব্দ এত কম? মনে হলো, কোথায় যেন একটা প্যাঁচ লেগেছে চিন্তার।

পরদিন চাকরটাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি– কী হে, শুনতে পাও না? আজও আর্তনাদ উঠেছে। শোন নি? তবে আগের চেয়ে আরও চাপা। অস্পষ্ট। বরং তুমি রাতে আমার ঘরে এসো। শুনিয়ে দেব? ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল চাকরটা– আপনের ভীমরতি অইছে। আমরা তো কিচ্ছুই হুনি না? খালি হুনেন আপনে? কাম নাই আপনের ঘরে গিয়া আমার শব্দ হোননের?

অবনী হতাশ হলেন। কিন্তু ভৃত্যের চোখে কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করলেন। আশ্চর্য। আজ রাতে শব্দ মোটে শোনাই যাচ্ছিল না। এত আস্তে, যে কান খুব সচেতন করে শুনতে হলো। তিনি অনুমান করলেন– ভৃত্যের কোনো যোগ আছে এর সাথে। নইলে বলার পর কেন শব্দ কমে এল? তিনি বুঝতে পারলেন, শব্দ তার ভেতরের নয় হয়ত। বাইরের। ও বাড়ির ভাড়াটে লোকটাকে দেখেন। চাকরটার মনিবকে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। ভদ্রলোক কী মনে করবেন অযাচিত প্রশ্নে? তাই বলা হয় না। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যায় মনের গহীনে।

অবনীবাবুর ঘুম চলে গেছে চোখের পাতা থেকে। রাত বারো বাজলেই তাঁর বারোটা বেজে যায়। এটা কি সত্যি শোনা, না কি তাঁর মনের ভুল– এ সিদ্ধান্তেই তিনি পারেন না পৌঁছুতে। কারো সাথে কোনো আলোচনাও করেন না, পাগল ভাববে বলে। তাছাড়া স্পষ্ট বুঝতেই পারছেন না যে, ওই আর্তনাদটা কি তার ভেতরের, না বাইরের? কখনও মনে হয়– ও তার আত্মার ক্রন্দন। কখনও মনে হয়– না, বাইরের কেউ। অবনী কিছুই বলেন না কাউকে। শুধু ভাবেন। আর রাত বারো পেরুলেই উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন, কখন শুনবেন সেই কাঙ্ক্ষিত অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ।

আর্তনাদটা চাপা গোঙানি হয়ে কানে এসে লাগল এক রাতে। মনে হয় কবরের মধ্য থেকে বের হয়ে আসছে জীবন্ত চাপা কারো আর্তনাদ। ভয়ে ঘাম ছুটল। কাঁপন ধরল শরীরে। তবু কী এক জেদে উঠে বসলেন অবনী। ভাবলেন– যা থাক কপালে আজ তদন্ত করবই। আস্তে করে দরোজাটা খুললেন। ভয়ে ভয়ে, শিকারী বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে, পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে, বাড়িটার বিপরীত দিকে চলে গেলেন; যেখানে আর্তনাদ ওঠা বাড়িটার একটা জানালা রয়েছে। ছোটখাটো বাগানের মতো একটু জায়গা। আম-কাঁঠাল, লিচু-সফেদা, আর কয়েকটা গোলাপ কাঁটার ঝাড়। জানালার কাচ বন্ধ। ভেতরে কালো পর্দা। আচ্ছা লোক তো? বাড়ির জানালায় কারো কালো পর্দা থাকে? বুক ঢিব্ ঢিব্ করে উঠল থেমে যাওয়া দমকলের মতো। যেন যে কেউ এ মুহূর্তে পিঠে হাত রাখলেই অবনীবাবু ফটাস। তিনি ভাবছেন– এ তো ভৌতিক কারবার রীতিমতো। এ বাড়ির দু'টো প্রাণী প্রভু-ভৃত্য, দু'জনই ভূত নয়ত? ভেতরটা দেখার জন্য ছিদ্র খুঁজলেন তিনি। পারলেন না। তবে ভেতরে যে মৃদু আলো আছে, তা বোঝা যায়। তবে আলোর রঙটা বোঝা যায় না। কেন না পর্দাটা কালো।

গোঙানির সাথে সপাৎ সপাৎ চাবুক পেটার শব্দ। তবে কি চাকরটাকে রোজ রাতে চাবুক পেটা করে মনিব? পালিয়ে যায় না কেন তবে চাকরটা? নানা প্রশ্ন জাগছিল মনে। কিন্তু উত্তর অজানা। প্রশ্ন থাকলেই তার পাশে উত্তর থাকে না সব সময়। আমগাছের একটা ডালে উঠে পড়লেন অবনী। গবাক্ষে চোখ রাখলেন। ভেতরে ম্রিয়মাণ নীল আলো। কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। কারণ গবাক্ষ থেকে বেশ নিচে থাকে মানুষ। আর একটু উপরে উঠতে চাইলেন। খেয়াল করেন নি একটা মরা ডাল ধরেছেন। ধপাস করে পড়লেন নিচে। জ্ঞান হারান নি। হার্ট অ্যাটাকের অবস্থা।

অবনীবাবুর জ্বর। তাই কাঁচ-কলা, আলুসেদ্ধ আর চাল চড়ল না উনুনে। ভদ্রলোক নিরামিষাশী। সকালে এই সিদ্ধই চলে। দুপুরে চা বিস্কুট। স্কুলেই। বিকেলে ভাত। সব্জি আর ডাল। সজনের ডাঁটা বেশ পছন্দ। আজ সকালে ফুটপাতের দোকান থেকে এসছে পাউরুটি আর চিনি। কাল রাতে ফেরার পরই ঘটল ঘটনাটা। টেবিলে এক গেলাস জল ছিল ঢাকা দেয়া। পিপাসা পেয়েছিল বেশ। ঢাকনা সরিয়ে গেলাস ধরতেই চিৎকার করে উঠল জলের গেলাস। একে একে ঘরের চেয়ার, টেবিল, চৌকি, আর্তনাদ করে উঠল সব। ভয় পেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তাঁর মনে হচ্ছিল– এ তার আত্মার অন্তর্গত আর্তনাদ। মনে হচ্ছিল– পৃথিবীর ভেতরের আর্তনাদ। প্রতিটি বস্তুকণার আর্তনাদ। অণু-পরমাণুর আর্তনাদ। ঘুম আর হয় নি।

স্কুলে যেতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই ঘরে পড়ে থাকা। অবনীবাবু জানালা দিয়ে দেখল– পাশের বাসার লোকটি যথাসময়ে বের হয়ে গেল। যথাসময়ে এ কারণে যে, একই সময়ে বের হয়ে যায়। আবার একই সময়ের দিকে ফেরে। প্রতিদিন দশটা নাগাদ বের হয়ে যায়। আর একবার ফিরতে দেখে রাত আটটা-ন'টা নাগাদ। দুপুরে দেখা যায় না। কারণ অবনীবাবু তখন স্কুলে। গায়ে পড়ে খোঁজ নেয়াটা পছন্দের নয় অবনীবাবুর। তাই পরিচয় জানা হয় নি লোকটার।

একটু পরে চাকরটাও বের হয়ে গেল বাজারের থলি হাতে। দেখলেন, বাসাটা এখন একদম খালি। হঠাৎ মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি এল। উঠে পড়লেন। আবার পাঁচিলের গা ঘেঁষে পেছনের বাগানে। জানালা বন্ধ। কালো

পর্দা। তাহলে কি দিনরাত সব সময়ই বন্ধ থাকে জানালা? এমনও হতে পারে, বাইরে যাবার কারণেই জানালা বন্ধ করে রেখে গেছে। যাই হোক, ভাঙা একখণ্ড ইট তুলে নিলেন হাতে। এবং জানালার এক কোণের কাচে দিলেন ঘাই। ভেঙে গেল একটু। গাছের মড়া একটা ডাল নিলেন তুলে। পর্দা সরিয়ে দেখলেন, একটা চৌকি। আলনা। আলনায় জামা-কাপড়। একটা টেবিল। একটা হাতলহীন চেয়ার। চাকরটা সম্ভবত রান্নাঘরে শোয়। চৌকির একপাশে বেশ মোটা একগাছা বড় নায়লনের দড়ি। দেয়ালে ঝুলানো একটা চাবুক। ছাঁৎ করে উঠল বুকটা। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পান তিনি। ওই চাবুক পেটার শব্দ রোজ বিদ্ধ করে তাকে। ফিরে এলেন তিনি জানালা থেকে। ভাবলেন– আজ রাতে আবার তদন্ত করতে হবে। বাসায় এসে ছটপট করতে লাগল মন। মনে হয় তখনই রাত বারোটা বাজলেই ভালো হয়। অবনীবাবুর এই এক বাতিক– যখনই যেটা মনে হবে, সেটার সংশয় দূর না হওয়া পর্যন্ত ওই একই চিন্তা মনের মধ্যে লাটিমের মতো ঘুরপাক খায়। ঘরে আর মন বসল না। তাই পোশাক পরে স্কুলের পথে পা বাড়ালেন ওই অসুস্থ শরীরেই।

ভাবকে ভাবতে অবনীবাবু বাজারের পাশ দিয়ে চললেন হেঁটে। দেখেন, বাজার করে ফিরছে চাকরটা। হঠাৎ চোখাচোখি হওয়ায় কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে চাকরটা অন্য পথ নেয়। অবনীবাবুর দৃষ্টি এড়াল না তা। মনটা খঁচ করে উঠল। স্কুলে পৌঁছালেন। টিচার্স রুমে ঢুকলেন। মনে হয় এখানেও সেই চাপা একটা আর্তনাদ। চক নিলেন। ডাস্টার নিলেন। খাতা নিলেন। ক্লাসরুমে ঢুকলেন। খাতা আর ডাস্টার টেবিলে রেখে চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে গেলেন। বোর্ডে ঘঁষা লেগে চকটা আর্তনাদ করে উঠল। ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেন তিনি। হঠাৎ সপাৎ সপাৎ চাবুক পেটার শব্দ। পাশের রুমে। চাপা একটা গোঙানি। উঃ। আঃ। খেয়াল নেই এটা ক্লাসরুম। ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেই রুমের দিকে। দেখেন– শিক্ষক ছাত্রকে পেটাচ্ছে বেত দিয়ে। সংবিৎ ফিরে পেলেন। ফিরে এলেন। আর পড়ালেন না ছাত্রদের। বই খাতা নিয়ে সোজা টিচার্স রুমে। বসবার জন্য চেয়ারটা টান দিলেন। চেয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল। চমকে উঠলেন।

মাথার ভেতরে আর্তনাদ। আত্মার ভেতরে আর্তনাদ। চেতনার ভেতরে আর্তনাদ। কিন্তু বলতেও পারছেন না কাউকে। অন্য কেউ যদি শুনে না থাকে? যদি শুনতে না পায়? যদি সত্যি না হয়? যদি পাগল ভাবে? অতএব, বললেন না কাউকে। শুধু ঝাঁপির সাপের মতো মনের ভেতর পুষে রাখলেন মনের কথা। চিন্তা এখন একটাই। এরকম হচ্ছে কেন? সর্বত্র সে এমন আর্তনাদ শুনছে কেন? অন্য কেউ কি শুনছে না? কেন শুনছে না? প্রশ্নগুলো এবং প্রশ্নের না পাওয়া উত্তরগুলো আরও বিভ্রান্ত করছে তাঁকে। মাথার ভেতর সব কেমন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য চিংড়ির মতো অস্বস্তি দাপাচ্ছে মনের ভেতর। অবনীবাবুর এখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে– 'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

সেই রাতেই অবনীবাবু উদ্‌ঘাটন করলেন প্রকৃত রহস্য। রাত বারো পেরুলেই বাড়ির পেছনে চলে গেলেন চুপি চুপি এবং ভাঙা জানালায় চোখ রাখলেন চোরের মতো। যা দেখলেন, তাতে ভিমড়ি খেয়ে পড়ার যোগাড়। রীতিমতো অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ব্যাপার। দেরি না করে, সাথে সাথেই তিনি পুলিশে খবর দিলেন। পুলিশ এসে মনিব-ভৃত্য দু'জনকেই গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন থানায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অবনীবাবুকেও। এরপর পুলিশের জেরা অনেক রাত অবধি–

– আপনার নাম কী?

– বলব না।

– আপনার পরিচয়?

– বলব না।

– আপনি কী করেন?

– বলব না।

কেমন গ্যাঁরাকল? লোকটা 'বলব না' ছাড়া আর কোনো কিছু বলে না। 'বলব না' ছাড়া আর কোনো শব্দ মনে হয় জানে না। একটামাত্র শব্দই মনে হয় শিখেছেন। আশ্চর্য!

– আশ্চর্য! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা পুলিশের লোক।

– না। ভুলি নি।

– তবে বলছেন না কেন?

– সে আমার ইচ্ছে। না বলার স্বাধীনতা আমার আছে।
– না। নেই। আপনি অপরাধ করেছেন।
– অপরাধ কাকে বলে?
– এ ও এক অপরাধ।
– অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তাতে। এ আত্ম-নির্যাতন।
– আপনি বলবেন না কিছুই?
– না। কিচ্ছু বলব না।
– জানেন কী শাস্তি দিতে পারি আপনাকে?
– না। জানার প্রয়োজনও নেই।
– আপনার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।
– তাহলে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতাম।
– তবুও বলবেন না, কে আপনি, কেন এ সব করছেন?
– না। বলব না। আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, প্লিজ। যে শাস্তি দেবেন, দেন।
তার বাসা তদন্ত করে যা জানা গেল– তিনি সৌরভ দাস। জীবন বীমায় চাকুরি করেন। কাজের লোককে জিজ্ঞেস করেও কোনো তথ্য উদ্ঘাটন করা গেল না। শুধু জানা গেল– এক সন্ধেয় ফিরে এসে তার মনিব খুব ড্রিংক করল। দিনটি ছিল পহেলা মার্চ। চাকরকে ডেকে বলল– আজ থেকে তোর বেতন এক হাজার টাকা। কিন্তু এক শর্তে। প্রতিদিন রাত বারোটা থেকে দু'টো পর্যন্ত একটা কাজ করতে হবে। একগাছ দড়ি বের করে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল– আমি ড্রিংক করে এ চেয়ারটায় বসব। তারপর তুই আমার হাত-পা, বুক-পেট পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধবি চেয়ারটার সাথে। এরপর এই চাবুকটা দিয়ে পুরো এক ঘণ্টা উপর্যুপরি পিটাবি। শুধু গলার উপর বাদ। পেটানো শেষে ঘুম পাড়ানো ইনজেকশন দিবি। এরপর আমার মাথায় হাত বুলাবি। যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করবি। আমি যখন ঢলে পড়ব ঘুমে, তখন বাঁধন খুলে শুইয়ে দিবি বিছানায়। আমি কিচ্ছু বলব না তোকে। কিন্তু যদি তুই রাজি না হস্ কিংবা কাউকে বলে দিস্ তবে তোর সর্বনাশ নিশ্চিত। আর কেন আমি এ সব করছি, কোনোদিন এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করবি না আমাকে। যদি অন্যথা হয়, তবে তোর মারাত্মক অসুবিধা হবে। বরং বেশি করে টাকা পাঠাবি বাড়িতে। তাছাড়া কারো তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না? এ আর এমন কী যে তুই পারবি না?
চাকরটার মনে পড়ে গেল বাড়ির কথা। অভাবের সংসার। এক ছেলে-দু'মেয়ে নিয়ে স্ত্রীর কত কষ্টে কাটে সংসার। বড় মেয়েটির বিয়ের বয়স। অথচ গায়ে ছেঁড়া শাড়ি। বিয়ে দেয়া তো দূরের কথা। ভয়ে পড়ে এবং টাকার লোভে চাকর রাজি হয়ে গেল। এ ছাড়া আর কোনো তথ্য দিতে পারল না সে। অবনীবাবুর কাছ থেকে জানা গেল– তিনিও সেই পহেলা মার্চেই আর্তনাদ শুনতে পান প্রথম। পরদিন চাকরের সাথে আর্তনাদ বিষয়ে কথা বললে তা আরও অস্পষ্ট ও চাপা হয়। কাজের লোক বলল– অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করার পর মনিবকে এ কথা বললে তিনি একটা গামছা দিয়ে তার মুখ বেঁধে রাখতে বললেন। যার জন্য চিৎকার কম শোনা যাচ্ছিল।
সাংবাদিকরা এসে মৌচাকের মতো ঘিরে ধরল। কিন্তু আর কোনো তথ্যই পারল না উদ্ধার করতে। তাই ছবি তুলে এবং যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারল, তাই নিয়ে চলে গেল। পরদিন প্রায় প্রতিটি দৈনিকেরই প্রথম পাতায় বড় করে ছবিসহ খবর ছাপা হলো– 'অদ্ভুত যুবকের রহস্যময় কাণ্ড'। তারই কয়েকটি কপি এনে সৌরভের হাতে দিয়ে পুলিশ সুপার বললেন– এখনও কি আপনি মুখ খুলবেন না?
– না।
এ সময় একজন সার্জেন্ট এসে সেলাম ঠুকে বলল– স্যার, একজন ভদ্রমহিলা এ ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে চান। উল্লসিত হয়ে উঠলেন সৌরভ–
– নীলা এসছে? প্লিজ, একটু নিয়ে আসুন ভেতরে।
সার্জেন্ট চলে গেল। এবার সৌরভের নীলস্বপ্ন বোনা। যে স্বপ্ন আকাশের মতোই বিস্তৃত নীল-শূন্য-সীমাহীন। একটু পরেই নীলা এসে ঢুকবে। তাকে দেখবে। এতদিনে তাহলে কেটে গেছে অভিমানী মেঘ? নীলা তার ভুল পেরেছে বুঝতে? ভারি পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে। সাথে ত্রস্ত অথচ মৃদু পদশব্দ। বুঝতে বাকি

নেই– ওই নীলা। ঘরের পর্দা সরে গেল। সাথে সাথে চোখ নামিয়ে নিল সৌরভ। কীভাবে তাকাবে নীলার দিকে? নীলা-পিপাসিত যে চোখ, অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে কীভাবে দেখবে সে তাকে? পদশব্দ এসে থেমে গেল কিনারে তার। নীলা এখন কত কাছে। ইচ্ছে হলেই স্পর্শ করা যায়। চোখ না তুলেই সৌরভ বলল– আমি জানতাম, তুমি আসবেই নীলা।

উত্তর এল– আমি নীলা নই, স্নিগ্ধা। নীলার বান্ধবী।

পিপাসার্তের মাথায় যেন রবফের চাঙড় পড়ল ভেঙে। বোবা চাউনি মেলে দিল স্নিগ্ধার দিকে। এক পলক। তারপর নড়ে উঠল ঠোঁট–

– তাহলে নীলা কোথায়? সে বুঝি পাঠিয়েছে তোমাকে?

– না। আমিই এসেছি। নীলার টেবিলে ছোট্ট একটু চিঠি। নীলা তার ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে আপনার কাছে।

– নীলা কোথায় এখন?

– হাসপাতালে। দেখবেন?

– আমি যাব। কী হয়েছে তার?

– পত্রিকায় আপনার খবর পড়ে, আজ সকালে বিষ খেয়েছে।

একথা শোনার পর অবনীবাবু মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে লাগলেন। বাতাসে তখন সপাৎ সপাৎ চাবুকের শব্দ। মাথার মধ্যে চাবুকের শব্দ। বুকের মধ্যে, আত্মার মধ্যে চাবুকের শব্দ। আর প্রত্যেক বস্তুকণার ভেতর, অণু-পরমাণুর ভেতর এক বীভৎস, হৃদয় বিদারক আর্তনাদ। অবনীবাবুর সর্বাঙ্গে ভূমিকম্প।

দুধবাবা

‘হোনছোস কাণ্ড! পাড়কোণার সাধু মা কালীর দুধ খায়। মাটির মূর্তির বুক থিইক্যা ফিন্‌কি দিয়া দুধ বাইরয়। দুধের বন্যা। মণকে মণ দুধ বার হতিছে মা কালীর বুক থিইক্যা। হাজার হাজার মানুষ ভেঙি পইড়ছে তা দেখতি। আর সাধু বাবাও লাল হইয়ে যাতিছে। এহোন আর কেউ তারে সাধু বাবা কয় না। দুধবাবা কয়। কেউ কিছু মানত করলি তা ফইলে যায়। কারো অসুখ বিসুখ হইলি দুধবাবার কাছে ছুটে যায়। দুধবাবা ঝাড়ফুঁক করি, কী সব খাতি দেয়; তাতেই মানুষ ভালো হইয়ে যায়। কারো কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা এ জন্যি নেয় না। তয়, বড় একটা সিন্দুক আছে তালামারা। মায়ের পূজার জন্যি কেউ কিছু দিতে চাইলি ওটার মদ্যি ফেলি দিতে পারে। পেত্তেকদিন মানুষ তার মদ্যি হাজার হাজার টাকা ফেলে। সোনা দানাও ফেলে। সে কী এলাহী কাণ্ড!’

– বলিস্ কী, সত্যি এসব?

– হ, সত্যি?

– কদ্দিন যাবৎ এ কাণ্ড?

– তা ম্যালা দিন।

– তুই গেছিলি দেখতে? দেখেছিস?

– হ, নিজের চোখকি বিশ্বাস করা যায় না। দুধবাবা ম্যা ম্যা করে মা কালীকে জড়াইয়া ধইরা বুকে মুখ দিয়া টান দিলে গাল ভর্তি দুধ। যতক্ষণ টানতে থাহে, ততক্ষণ দুধ বেরুতি থাহে।

যেই শুনবে, অবাক না হয়ে পারবে না। কাণ্ডটা কী, তা দেখতে না গিয়ে পারা যায় না। একেবারেই অসম্ভব। খবরটা শুনে আমিও তাই চটজলদি তৈরি। শীতের সকাল। গত রাতে গ্রামে ফিরেছি কয়েক মাস পরে। এম.এ. ফাইনাল শেষ। বড় ছুটি, অখণ্ড অবসর। কিছুদিন বেড়ানো যাবে আপাতত। রাতে রিক্সা না পাওয়ায়, বেশ খানিকটা পথ হাঁটতে হয়েছে। গা ব্যথা। ঘুমটাও জমেছিল সেজন্যে। ভোরের সেই মধুর ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল কাকাতো ভাই বিজয়। গ্রামের লোকেরা ভোরেই ওঠে ঘুম থেকে। ঘুম থেকে উঠেই শুনেছে আমার বাড়ি ফেরার খবর। আর তাই এলাকায় ভেসে বেড়ানো আজব খবরটা আমাকে না জানিয়ে থাকতে পারল না বিজয়।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, বুজরুকি মনে হচ্ছিল। আবার অবিশ্বাস করতেও পারছিলাম না, কারণ বিজয় নিজ চোখে দেখেছে। অগ্যতা গা ব্যথা ভুলে গেলাম। আর বারো মাইল দূরত্ব কোনো দূরত্বই মনে হলো না। এরকম ঘটনা মঙ্গল গ্রহে ঘটেছে শুনলেও না যেয়ে পারা যায় না। সেই কুয়াশা কুয়াশা শীত ভোরেই আমরা রওনা দিলাম কোটালিপাড়ার পাড়কোণার উদ্দেশ্যে।

বেলা দশটা/এগারোটায় পৌঁছে গেলাম পাড়কোণা আশ্রমে। চারদিক থেকে মানুষ পিঁপড়ের মতো লাইন দিয়ে আসছে-যাচ্ছে। গিজগিজ করছে মানুষ। স্থায়ী মেলা বসে গেছে আশ্রম ঘিরে। বিজয় বলল–

– দ্যাখছোস কী কাণ্ড! এ্যাহোন বিশ্বাস অইলো?

বিশাল একটা বটগাছের গোড়ায় মা কালীর মন্দির। অদূরেই মজা খালের পারে গ্রামের শ্মশান। মন্দিরটা টিনের তৈরি। মরচেপড়া টিনের চাল, মরচেপড়া টিনের বেড়া, মোটামুটি পরিত্যক্তই ছিল। কালেভদ্রে পূজা-অর্চনা হতো। দুধবাবা এসে মায়ের সেবক সেজেছে। আর রাতারাতি প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

বটগাছের মগডালে বাঁধা উঁচু লম্বা বাঁশের মাথায় উড়ছে লাল ঝাণ্ডা– নিশান। অনেক দূর থেকে সে নিশান দেখে পথের নিশানা করা যায়। পুরো এলাকা জুড়ে অনেক লোকের সমাগম হলেও সবকিছু নিয়ন্ত্রিত। হাতে লাল ফিতে বাঁধা স্বেচ্ছাসেবকরা লাটিমের মতো ঘুরছে যত্রতত্র। একদিকে সারিবদ্ধ দোকানপাট– মিষ্টির দোকান, শাঁখা-চুড়ি-চুলের ফিতার দোকান, খেলনার দোকান, খিলিপানের দোকান, ছবির দোকান– কী নেই? ছবির দোকানে ঝুলছে নায়ক-নায়িকার ছবি। উত্তম-সুচিত্রার ছবি। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলের বিকৃত ছবি। এক পাশে জুয়ার আড্ডা, এক দিকে চলছে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নাচ গানের মাতম– সাধু সন্ন্যেসীদের জিকির। আর এক পাশে গাঁজার দম। অন্য এক স্থানে সারাক্ষণ খিচুড়ি রান্না ও বিতরণ চলছে। ভক্তদের টাকাতেই এ

প্রসাদের ব্যবস্থা। কেউ চাল, কেউ ডাল, কেউ আলু-পটল-কুমড়া ইত্যাদি নিয়ে আসছে ভোগ এর জন্য। পাশেই ভাঁড়ার ঘরে জমা হচ্ছে সেসব।

যারা দুধবাবার দেখা পেতে চান বা দুধ পানের কেরামতি দেখতে চান তাদের জন্য মন্দির। সেখানেও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। বাঁশ দিয়ে মন্দিরের এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত সরু পথ করে দেয়া হয়েছে। একজন একজন করে অর্থাৎ লাইন ধরে যেতে হবে। চলমান লাইন। শুধু মায়ের সামনে এসে সামান্য একটু থামবে। সেখানেই লোহার সিন্ধুক তালাবদ্ধ। প্রণামী ওখানেই ফেলতে হয়। কেউ সাধুবাবার পদস্পর্শ করতে চাইলে বা পদধূলি পেতে চাইলে, বেড়ার একটা স্থানে কিছুটা ফাঁকা রাখা আছে, সেখান দিয়ে হাত বাড়িয়ে পা ছোঁবে। কারু প্রতি স্পেশাল করুণা হলে দুধবাবা কালীর বুকে মুখ লাগিয়ে দুধ টেনে নেন এবং সেই দুধ ভক্তের হাতে কুলকুচির মতো ফিক করে ফেলে দেন। ভক্ত চেটে পুটে খেয়ে মাথায় মুছে রাখেন। কারো কোনো অসুখ হলে কিংবা কোনো কিছু চাইলে তিনি একটা কিছু দিয়ে বলেন– 'খা মাটি, মাটি খা; মাটিতেই মিশে যা।' আর কোনো কথা তেমন বলেন না। তবে মাঝে মাঝে ষাঁড়ের মতো হুঁম করে হুঙ্কার দেন।

দুধবাবার গোঁফ, দাড়ি, চুল যতবড় হওয়া প্রয়োজন তার চেয়েও বড়; নিম্নাঙ্গে লাল কাপড় এবং উর্ধ্বাঙ্গে লাল উত্তরীয় জড়ানো। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কানে দুল। কপালে সিঁদুর। পানের রসে মুখ রক্তবর্ণ। গাঁজা-চরসে চক্ষু রক্তবর্ণ। ঠিক যেন কপালকুণ্ডলার তান্ত্রিক। পাশেই দুধবাবার সহধর্মিণী, কালভৈরবী। যা স্বাস্থ্য, চেহারা এবং গায়ের রঙ, অনেকে তাকেও সাক্ষাৎ জ্যান্ত মা কালী ঠাহর করে বসতে পারে।

যেহেতু লাইন একটাই, তাই নারী পুরুষ ওপথেই সাধু দর্শন করতে যায়। বিজয় আমার হাত ধরে লাইনে ঢোকার মুখেই এনে দাঁড় করাল, কিন্তু কী কারণে ঢুকল না। আমিও তার পেছনে দাঁড়ানো। একটু পরে যখন একটা মেয়ে লাইনে ঢুকল, দেখা গেল বিজয় তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেল এবং তার পেছনে আমাকে দাঁড়াতে ইশারা করল। লাইন খুব ধীরে, শম্ভুক গতিতে সামনে এগোয়; আমরাও।

আমি তো অবাক! গায়ে আমার কাঁটা দিচ্ছে। এও কি সম্ভব! বিজয় মিথ্যে বলে নি; মাটির প্রতিমার বুক থেকে দুধ বেরোচ্ছে! আমি স্থির হয়ে গেলাম। দেখছি এই অলৌকিক দৃশ্য। বিজয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি বিজয়ও একদৃষ্টে দেখছে, তবে অন্যকিছু। দুধ খাওয়া সে বহুবার দেখেছে। ও তার কাছে পুরনো কাসুন্দি। সে মা কালীর পাশে আনারকলিকে দেখছে। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি মেয়েটা দুধবাবার দু'বার মেট্রিক ফেল কন্যা ফুলকলি। অবশ্য মা কালী আর কালভৈরবীর পাশে তাকে সরস্বতী কিংবা লক্ষ্মীর মতোই লাগছিল। গাঁয়ের রঙটা চাপা কালো, টানাটানা চোখ, লম্বা চুল; সব মিলিয়ে দেবী দেবী লাগছিল। বিজয়ের দৃষ্টির স্থিরতার কারণ সেখানেই।

কেন যেন আমার প্রতি দুধবাবার অযাচিত করুণা হলো। কাছে এসেই বলল–

– হুঁম্।

মানে কী চাস্?

আমি কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি বলে, আবার বলল– হুঁম্, হুঁম্।

আমি এ ভাষার অর্থ বুঝলাম না। পাশেই ছিল একজন শিষ্য। তিনি অনুবাদ করে দিলেন– বাবা কইতেছেন, তোর মনে ময়লা আছে। মনটা পরিষ্কার কর।

আবার শব্দ– হুঁম্, হুঁম্, হুঁম্।

অনুবাদ এল– তোর মনে সন্দেহ। মনটারে পবিত্র কর।

ভয় ভয় করতে লাগল– সত্যিই তো আমার মনে সন্দেহ। মনে মনে আমি তো দুধবাবাকে বুজরুক ঠাউরেছি। বুঝল কী করে? তবুও কেন যে বাবার অযাচিত করুণা বর্ষিত হলো আমার উপর? মা কালীর দুধ মুখে ভরে এনে বললেন– হুঁম্। অনুবাদ– হাত পাত।

হাত পাতলাম। পুচ্ করে ছেড়ে দিলেন উষ্ণ উষ্ণ দুধ। মায়ের দুধ কবে খেয়েছি, মনে নেই তার স্বাদ। ভাবলাম, মা কালীর দুধ খেয়েই দেখি না কেমন লাগে। কিন্তু সাধুবাবা মুখে করে যে দুধটুকু দিলেন, খেতে কেমন ঘেন্না করছিল। ইতস্তত করছি। এ সময় আবার শব্দ– হুঁম্।

অনুবাদ– খা, খেয়ে নে; খা মাটি, মাটি খা; মাটিতেই মিশে যা।

যা থাকে কপালে, চোখ বুঁজে গিলে ফেললাম সবটুকু। আমার অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মতো; না পারছি গিলতে, না পারছি ফেলতে। এরপর সিন্দুকে প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু গা গোলাচ্ছিল। বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি নি। মা কালীর দুধ দই হবার আগেই বমি হয়ে গেল।

এবারে মেলা দর্শনে বেরুলাম। খিলিপানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রঙ-বেরঙের কাপড় জুড়ে তৈরি পোশাক পরে ক্লাউন সেজে খিলি বিক্রি করছে এক লোক। পানের উপর মশলা দিয়ে ফুলের মতো সাজানো। তাতে কী একটা তরল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর একটু দারুচিনি সেন্ট ঢেলে খেতে দেয়। পাঁচ টাকা করে দশ টাকা দিয়ে দু'জন দু'টো খিলি কিনে মুখে পুরে চললাম। বিজয় টেনে নিয়ে গেল জুয়ার আড্ডায়। গিয়েই পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বাজি ধরল। হারল। মুখ কালো করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল অন্যদিকে। গাঁজার আড্ডা। 'ব্যোম ভোলা' বলে বসে পড়ল বিজয়। কলকেটা হাতে নিয়ে কয়েক দম দিতেই নৃত্য শুরু। তাকে নৃত্য না বলে নেত্য বলাই ভালো। বিজয় যেন দক্ষযজ্ঞের সতীহীন শিব। শুরু হলো তাণ্ডব নৃত্য। ধাতস্থ হলে ভোগের প্রসাদ (খিচুড়ি) খেয়ে গাছের ছায়ায় কুম্ভকর্ণের ঘুম। ঘুম ভাঙে সন্ধের আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে। তখন আর বাড়ি ফেরার উপায় নেই বলে ওখানেই থেকে গেলাম।

দুই

সন্ধ্যা-আরতি। মন্দিরের সামনের চাতালে বসেছে আসর। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ার গন্ধে-শব্দে চারদিক আমোদিত। মাঝখানে সাধুবাবা, পাশে কালভৈরবী। খোল-করতাল-মন্দিরা বাজিয়ে চলছে কীর্তন। গান গাইছে পূর্ণশশী বাউল। বাবা এবং তার শিষ্যরা কিঞ্চিৎ মায়ের প্রসাদ, মানে কারণসুধা পান করে শুদ্ধ হয়েছে। কীর্তনের সময় চলছে গাঁজার দম। এক মুহূর্ত দেরি না করে বিজয় বসে পড়ল ধপাস করে। বলল– 'এহানেই থাইক্যা যাই। মায়ের সেবক হইয়ে, কী বলিস্? ভবিষ্যৎ ভালা আছে।'

আমি বললাম– 'সে তো বটেই। ভক্তির সাথে অর্থ, মোক্ষ, কাম, মদ, মুক্তি এবং ফুলির সান্নিধ্য সবই জুটবে।'

দুধবাবার একগাদা শিষ্যের মধ্যে বেশির ভাগই তরুণ। তার প্রধান কারণ ভক্তি নয়, ফুলকলি; ওরফে ফুলি। দুধবাবা যে মাছধরা ছিপ ফেলেছে গভীর জলে, ফুলি তার একটা বিশাল টোপ। টেংরা, পুঁটি এমনকি শোল-বোয়ালও টোপ গেলে। তরুণ ভক্তদের মধ্যে ফুলির কাছাকাছি বসে যে, নাম তার হিতেন; এলাকার মেম্বর হীরেন্দ্রের একমাত্র ছেলে। কলেজে পড়ে। দুধবাবার অন্যতম প্রধান একজন সাগরেদ। সাগরেদ না বলে লাঠি বলাই ভালো। দুধবাবার শক্ত, তরুণ একটা লাঠিবাহিনীও আছে। যদি কখনও প্রয়োজন পড়ে। এই লাঠিবাহিনীর মূল ভিত্তি ফুলি। আর মায়ের প্রসাদ-গাঁজা কিংবা কারণসুধা। সে আসর বসে সন্ধের পরে। আরতির মাধ্যমে যার শুরু, শেষ তার বিপিন বাবুর কারণসুধায়।

বিজয়ের সাথে সাথে আমিও বসে পড়লাম আসরে। পূর্ণশশী বাউলের গায়ের রঙ যা, তাতে তাকে পূর্ণকালী বাউল কিংবা পূর্ণনিশি বাউল বলাই সমীচীন। নয়ত অমাবস্যা বাউল বলাই ভালো। কণ্ঠটা কিন্তু তার বেশ মিষ্টি। গান ধরেছে– 'শ্যামা নামের লাগল আগুন, আমার দেহ-ধূপকাঠিতে ...।'

দুধবাবার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য– খুব একটা কথা বলেন না। শুধু হুম্ হুম্ করেন। কালেভদ্রে দু'একটা কথা বলেন। তাও ভক্তদের উদ্দেশ্যে– 'খা মাটি, মাটি খা; মাটিতেই মিশে যা।' হিতেনের কাছে ফুলি যেন আগুনের ফুলকি। লক্ষ্য করলাম আরতির ফাঁকে হিতেন আর ফুলির খুনসুটি। বিজয় বলল– 'জানোস্, ফুলির সাথে মেম্বরের ছাওয়ালের পিরিত?' আমি বললাম– 'তলে তলে এতো খবরও যোগাড় হয়ে গেছে?'

বিজয় যেন বিবিসি। সব খবর জানে এবং তথ্যগুলো মোটামুটি নির্ভুল। বিজয়ের কাছে শুনলাম– মেম্বরকে নাকি দুধবাবার প্রণামীর ভাগ দিতে হয়। জুয়ার আসর বসিয়েছে মেম্বর। জুয়াড়িরা প্রতিদিন এ বাবদ টাকা দেয়। মেলার বিভিন্ন দোকান থেকেও নাকি চাঁদা তোলা হয়।। চেয়ারম্যানও তার ভাগ পায়। চেয়ারম্যান-মেম্বরদের একটা বড় আয় এই মেলা।

খেয়াল হলো বিজয় গাঁজা টেনে আউট। সে কখনও মা কালী সাজে, কখনও মহাদেব; কখনও সিরাজ-উদ-দৌলা। এক সময় বিজয় অহল্যা পাষাণী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকেই ইতোমধ্যে কুপোকাৎ। আমার ঘুম আসছিল না মোটেই। তাই বেরিয়ে পড়লাম রাত্রি দর্শনে। রাতের মেলারও একটা রূপ আছে। সেটা অন্যরূপ।

মায়ের দুনিয়ায় শোবার জায়গার অভাব নেই কোনো। যে যেখানে যেভাবে পেরেছে; শুয়েছে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। চিন্তা যেন সব চিন্তামণির। মায়ের। তারা নিশ্চিন্ত। কেউ গাছতলায়, কেউ কাপড় ছাউনি করে, কেউ খোলা মাঠে আকাশ টাঙিয়ে। ঘুমে বেশবাস কারোরই শ্লীলতার পর্যায়ে নেই। কেউ সোজা হয়ে, কেউ বাঁকা হয়ে, কেউ কুকুরের মতো কুঁকড়ে শুয়ে আছে। কেউ কেউ কুম্ভের মেলার নাগা সন্ন্যাসীদের মতো সেজে ঘুমুচ্ছে। তখনও চলছে জুয়ার আড্ডা। শীত যেন সাধু কিংবা ভক্তদের স্পর্শ করতে পারছে না। কোথাও কোথাও কয়েকজন মিলে চলছে গাঁজার দম। কোথাও দেশি মদ কিংবা চোলাইয়ের আড্ডা। কোথাও ঢোল-করতাল বাজিয়ে চলছে বাইরে থেকে আসা ভক্তদের কীর্তন। এক জায়গায় এক পাগলি বসে একা একা হাসছে, কথা বলছে, গান গাইছে– 'গাছপাগলের মেলা দ্যাখ, পাগলা বাবার ঠেলা দ্যাখ, কালভৈরবীর খেলা দ্যাখ'। একটা কুকুর দৌড়ে যাবার সময় একটু থেমে, পাগলিটার দিকে একটু তাকিয়ে আবার ছুটতে লাগল। কয়েকটা দোকানের পেছনে, অন্ধকার যেখানে কিছুটা গাঢ়; ফাঁসুড়-ফুসুড় শব্দ। লাস্যময় হাসি। খেয়াল করে দেখলাম– তরঙ্গায়িত এক মেয়ে, হাসির হিল্লোল খেলে যাচ্ছে সারা গায়। তাকে ঘিরে কয়েক তরুণ ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। অন্ধকারের স্রোতটা যেন ওখানে ঘূর্ণির সৃষ্টি করছে।

তিন

দুধবাবাকে দেখে ফিরে আসার পর নাস্তিক আমার মধ্যেও কেমন একটু ভক্তি ভক্তি ভাব জন্মেছে। মাটির মূর্তির বুক থেকে দুধ খাওয়া, সত্যিই এক অলৌকিক ব্যাপার। শহরে ফিরে এসেও ঘোর কাটতে সময় লেগেছে ঢের। এ বিষয় নিয়ে তর্কও করেছি বন্ধুদের সাথে। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব কী করে? তারপর সে দুধ আমি নিজেও খেয়েছি। দুধবাবাকে সত্যি অসীম ক্ষমতাধর, সিদ্ধ পুরুষ না বলে উপায় নেই।

বেশ কয়েক মাস শহরে কাটিয়ে আবার বাড়ি ফিরেছি ছুটিতে। ব্যাগটা কেবল নামিয়ে রেখেছি, পোশাকও পাল্টাতে পারি নি। খবর পেয়েইে কোথা থেকে ছুটে এসেছে বিজয়– 'হোনছোস্ ঘটনা; কাণ্ড একখান ঘটছে!'

– কী কাণ্ড?

– হে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড।

– বল না কী?

– আইজ থাউক। তুই জিরা। কাইল কবোনে।

– হেঁয়ালি রাখ তো? বল কী হয়েছে?

– দুধবাবা ফক্কাস।

– ফক্কাস মানে? মারা গেছে?

– আরে না, ফুইট্টা গেইছে।

– পালিয়ে গেছে?

– না, না। পুলিশে ধইরে নিয়া গেইছে।

– কেন?

– হালায় ভণ্ড। আস্ত একটা ঠগবাজ।

বিজয়ের কাছে যা শুনলাম, তা আর এক বিস্ময়ের জন্ম দেয়। মানুষ এত চতুর হয়? কী ভয়ঙ্কর ধূর্ত দুধবাবা। জালবাবা। পুলিশ তাকে শ্রীঘরে চালান করে দিয়েছে স্ত্রী এবং তিনজন শিষ্যসহ।

দুধবাবার এই অলৌকিক শক্তির কাহিনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ডি.বি. পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। কেউ শিষ্য সেজে, কেউ পাগল সেজে, কেউ ভক্ত সেজে ঘুরঘুর করতে লাগল বাবার চারপাশে। জানা গেছে তার শিষ্যদের মধ্যে একজন হলো মাতাম গোসাই। সে নাকি ডি.বি. পুলিশের লোক। মা কালীর মন্দিরের লাগোয়া হলো ভাঁড়ার ঘর। সে ঘর প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে। চাবি থাকে প্রধান শিষ্য জয়গোবিন্দের কাছে। জয়গোবিন্দ লোকটা বেশ ধূর্ত। ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা সব সময় কোমরে রাখে গাঁটের মধ্যে। এক পলকের জন্যও এদিক সেদিক হয় না।

ভাঁড়ার ঘরের পরের ঘরে থাকে দুধবাবা। পাশেই আরও দু'টো ঘর আছে। তার একটাতে থাকে ফুলকলি। অন্যটাতে জয়গোবিন্দ এবং সদানন্দ। ইচ্ছে হলেও মাতাম ভাঁড়ার ঘরের চাবি হস্তগত করতে পারে নি। দীর্ঘদিন তক্কে তক্কে থেকে একদিন চাবির তোড়াটা একা পেয়ে, ঝট্ করে ভাঁড়ার ঘরের তালাটা খুলে এমনভাবে রেখে দিল যে, যে কেউ ভাববে তালাটা লাগানো রয়েছে। জয়গোবিন্দ খুলতে গেলেই তালাটা খোলা দেখে প্রথম হকচকিয়ে যাবে। পরে যুক্তি দাঁড় করাবে– চাবি ঢুকাতেই তালাটা খুলে গেছে কিংবা তালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছিল। সন্ধের আরতিতে যখন সবাই কুপোকাৎ, সে সময় ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে টর্চের আলোতে দেখে নেবে সেখানে কী আছে? বা কী থাকে? যা কিছু রহস্য, তা ওই ভাঁড়ার ঘরেই। এবার বেরুবেই থলের বেড়াল।

সারাদিনে সকালের দিকে একবার মাত্র খোলে এবং সবসময় সেটা বন্ধ থাকে কেন? সারাদিনে আর খোলে না বলেই তালাটা খোলা না বন্ধ রয়েছে, সেটা খেয়াল হবে না জয়গোবিন্দর কিংবা অন্য কারোর। সেটাই ভরসা। সেদিন আরতির শেষাংশে সিদ্ধি এবং কারণসুধার ক্রিয়া যখন সক্রিয়, তখন এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে টুপ্ করে উঠে পড়ে মাতাম। চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরের কাছে এসে পরখ করে– না, কেউ নেই ধারে কাছে কোথাও। তালাটায় হাত দেয়। খোলাই রয়েছে। আস্তে করে দরোজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল। ছোট্ট টর্চটা ফেলে পুরো ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভালো করে দেখে মাতাম গোসাই অবাক। এই তাহলে দুধবাবার কেরামতি? সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে। দরোজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে ফিরে আসে আরতিতে। আরতি শেষে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। সবাই যখন গভীর ঘুমে, মাতাম বেশ পাল্টে বেরিয়ে পড়ে থানার উদ্দেশ্যে। কোটালিপাড়ার ওসিকে সব ঘটনা বলে, পরিকল্পনা করে সে আবার ফিরে আসে সবাই ঘুমে থাকতেই। সাধু সেজে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন পূজার আয়োজন। নিত্যদিনের মতো দুধবাবা মায়ের পূজা সম্পন্ন করে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করছে। ভক্ত সেজে পুলিশ এসেছে বাবার প্রসাদ পেতে। তারা লাইনে দাঁড়িয়ে প্রসাদের অপেক্ষা করছে। ওদিকে মন্দিরের চারপাশে রয়েছে বেশ কিছু পুলিশ। জায়গায় জায়গায়। পুলিশ অবশ্য মাঝে মধ্যেই আসে বলে কারো মনে তেমন কোনো সন্দেহ বা উদ্বেগ নেই। ভক্তবেশী পুলিশ বাবার সামনে গিয়ে হাত পাতে– বাবা, প্রসাদ।

– হুম্, হুম্, হুম্।

– বাবা আমরা পাপী। কৃপা কর।

– খা মাটি, মাটি খা; মাটিতেই মিশে যা।

বলেই বাবা 'মা' 'মা' বলে ছুটে গিয়ে মা কালীর বুকে মুখ লাগায়। না, কোনো দুধ বেরোয় না। আবার টান দেয়। এবারো কোনো দুধ আসে না। সাধুর চক্ষু চড়কগাছ। হাল ছাড়ে না। চট করে মাথায় শয়তানি বুদ্ধি খেলে যায়। বলে– তোরা বড় পাপী। মা তোদের প্রসাদ দেবে না। দূর হ তোরা। নইলে ভস্ম হয়ে যাবি।

জয়গোবিন্দকে চোখের ইশারা করতেই চলে যায় ভাঁড়ার ঘরের দিকে। চট্ করে উঠে পড়ে মাতাম। ফলো করে জয়গোবিন্দকে। জয়গোবিন্দ ভাঁড়ার ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢোকে। আস্তে করে মাতামও ঢুকে পড়ে। চমকে ওঠে জয়গোবিন্দ। বলে ওঠে–

– তুই কী চাস্ এহানে?

– বাবা ইশারায় আসতি কইলো।

– সাবধান, শব্দ করবিনে।

মাতাম আসার সময় পুলিশকে ইশারা করে আসছিল। যথাসময়ে মাতামের কাশি এল। আর কাশির সঙ্কেত বেয়ে পুলিশ ঢুকে পড়ল ভাঁড়ার ঘরে। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল দুধবাবার কারসাজি।

ছোট্ট এ ঘরটিতে তেমন কিছুই নেই। কতগুলো গুঁড়ো দুধের প্যাকেট; কতগুলো দুধভর্তি, কতগুলো খালি। এক বস্তা চাল, এক ব্যাগ ডাল, একটা বড় সয়াবিনের টিন, একটা কেরোসিনের টিন, এক বোতল সর্ষের তেল, এক ডিব্বা ঘি– এই বলতে গেলে জিনিসপত্র। একটা কলস জলভর্তি। একটা জগ। ঘরটা দেখে কারও কিচ্ছু বোঝার উপায় নাই। কোনো কিছু সন্দেহ করারও নেই। কেবল এক জায়গায় এক পাশে চৌকো এক খণ্ড হার্ডবোর্ড এমনি এমনি মাটিতে পড়ে রয়েছে– এইটেই সন্দেহের। গত রাতে মাতাম যখন এ ঘরে আসে,

সে কিছুই উদ্ধার করতে পারে নি। বোর্ডের টুকরোটা আগেই তার নজরে পড়লেও মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি। হতাশ হয়ে যখন ফিরবে তখন তার মনে সামান্য কৌতুহল জাগল ওটা সম্পর্কে। আনমনে সেটা তুলতেই আলাদিনের চেরাগ পেয়ে গেল হাতের মুঠোয়। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেখানে রাখা হয়েছে বড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল। তাতে একটা ঢাকনা। সেটা সরাতেই সে তাজ্জব বনে যায়। পাতিলের প্রায় অর্ধেক ভর্তি দুধ। পাতিলের মধ্যে ডুবানো প্লাস্টিকের দু'টো নল। তা মাটির নিচ দিয়ে পাশের ঘরে; অর্থাৎ মা কালীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাতামের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গুঁড়োদুধের বাক্সগুলো কী জন্যে এখানে? হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। প্লাস্টিকের নল দু'টো পাতিল থেকে তুলে নলের মুখ দু'টো পাতিলের বাইরে রেখে আবার যেমন, তেমন করে রেখে এল এবং সবাই ঘুমালে দৌড়ে থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দিয়ে এল।

ভাঁড়ার ঘর থেকে হাতকড়া পরিয়ে জয়গোবিন্দকে মা কালীর সামনে নেয়া হলো। পুলিশ রাইফেলের বাট দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল মা কালীর বুক। দুই স্তনের মুখে বেরিয়ে এল দুটো নলের মুখ। যে নল দু'টোর অন্য প্রান্তের মুখ ডুবানো থাকে পাশের ভাঁড়ার ঘরের ঐ দুধ ভর্তি পাতিলের মধ্যে। দুধবাবা মা কালীর বুকে মুখ লাগিয়ে যখনই টান দেন, তখনই নল বেয়ে ভাঁড়ার ঘরের পাতিল থেকে দুধ চলে আসে দুধবাবার মুখে। নল দু'টো কালীর মূর্তি বানানোর সময় কালীর পায়ের ভেতর দিয়ে বুক পর্যন্ত আনা হয়েছে খুব চতুরতার সাথে। বাইরে থেকে দেখে কারো বোঝার কোনো সাধ্য নেই।

হাতকড়া পরাল দুধবাবা এবং তার স্ত্রী কালভৈরবীকে। সাথে আরও দুজন শিষ্যকে। তারপর হাজতে চালান। মোটা দড়ি দিয়ে কোমরে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল মেলার মাঠ দিয়ে। মাথা নিচু করে চলল তারা থানার উদ্দেশ্যে মেলার মাঠ পেরিয়ে। পুলিশের ভয় উপেক্ষা করে জনরোষ পড়ল গিয়ে তাদের ঘাড়ে। কেউ একটা গুঁতো মারে, কেউ ছেটায় থুতু। কেউ দেয় রুদ্রাক্ষের মালা ধরে টান; কেউ ধরে টান দেয় পরনের কাপড় কিংবা কৌপিন। এভাবেই মেলা পেরিয়ে দুধবাবা পৌঁছে যায় জেলখানার গেটে। শেষ হয় একটা অধ্যায়। যে কোনো কারণে ফুলকলিকে পুলিশ হাতকড়া পরাল না বা নিয়ে গেল না ধরে। তার প্রতি কোনো মনযোগও দিল না। ফুলকলি পড়ে রইল মন্দিরে। ভাঙা মূর্তির পায়ের কাছে। তার কান্নায় কারো সহানুভূতি জাগল না; মূর্তিও দিল না কোনো ভরসা।

বিজয়ের মুখে এসব কথা শুনে আমি একেবারে থ'। কেমন বিশ্বাস হচ্ছিল না এ সব। বিজয়কে বললাম– যা বললি সত্যি?

– তালি আর কতিছি কী? কাইল চল, নিজের চক্ষি দেইখে আসতি পারবি। আগে যেমনি শ্মশান ছিল, এহনও তেমনি শ্মশান। যাবি?

বললাম– সকাল হোক।

দূর থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না পাড়কোণা দুধবাবার মন্দিরে বটগাছের উঁচুতে বাঁধা লাল নিশান। বাতাসে ভেসে আসছিল না কোনো মেলার গন্ধ বা শব্দ; জনকলরব। কোনো সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে যেন। আমরা দু'জন এসে যখন পৌঁছালাম আশ্রমবাড়ি, তখন সুনসান দুপুর। চারদিকে খরার দাপট। জনমুনিষ্যি নেই কোথাও। বটগাছে বসে কু-ডাক ডাকছে একটা দাঁড়কাক। মন্দিরের ভাঙা বারান্দায় শুয়ে আছে রোগা একটা কুকুর। নিঃসঙ্গ। খারাপ লাগছিল চারদিকের করুণ দৃশ্য দেখে। দুধবাবার জন্য কোনো সহানুভূতি না থাকলেও কেন যেন এ দৃশ্য আমাকে কষ্ট দেয়, শূন্য শূন্য লাগে– ওই কুকুরটার মতোই নিঃসঙ্গ লাগে। আমি যেন কোন অতীতে ফিরে যাই। দূর কোনো নির্জন প্রান্তরে।

জন্ম-জন্মান্তরের ওপার থেকে সে প্রান্তর চিরে হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর এসে আমাকে তীরের মতো বিদ্ধ করে– 'পানু, শিগ্‌গির আয়?' আমি আমার অস্তিত্ব বিচারে মগ্ন তখন। সামান্য সময় দরকার হয় বর্তমানে ফিরে আসতে। বিজয় যেন কখন উঠে গেছে মন্দিরে। স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে চলে গেছে মা কালীর ঘরে। আমি খেয়াল করি নি। ভাঙা দরোজা দিয়ে আমি উঠে যাই। বিস্ময়-ভীতি-বিহ্বল মাখানো চিৎকার আমাকে তাড়া করে। কী ঘটেছে, কে জানে? ভেতরটা কেমন অন্ধকার, স্যাঁৎস্যাঁতে। নরকটা বোধ হয় এরকমই। মাকড়সার জাল জড়িয়ে যায় মাথায়। কেমন বাজে একটা গন্ধ এসে খামচি মারে নাকে। রাতে মনে হয় ছুঁচো, ইঁদুর আর শেয়ালের কেত্তন চলে। আবারও আর্তনাদ করে ওঠে বিজয়– 'পানু'। আমি আঁৎকে উঠি।

আমি দৌড়ে যাই চিৎকারের উৎস সন্ধানে। গিয়ে দেখি– এ ঘর তার 'কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'– তার মধ্যে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজয়। ট্রাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলে হাতটা সামনে প্রসারিত। বিজয় বাক রহিত। আঙুলের ইশারা বেয়ে আমার দৃষ্টি চলে যায় লক্ষ্যবস্তুতে। অন্ধকারের মধ্যে আরও অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রহস্যময় এক ছায়ামূর্তি। চমকে উঠি। কে ও? ভয়ে আমারও কোনো কথা সরে না মুখে। বিবস্ত্র এক নারী। হাত দু'টো উপরের দিকে তোলা। একটা পা একটু উঁচু করে সামনের দিকে একটা পাতিলের উপর রাখা। লম্বা জিভটা মুখের বাইরে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা। চোখে হিংস্রতা। স্বয়ং মা কালী সামনে দাঁড়িয়ে। গলায় নৃ-মুণ্ড মালা তো দূরের কথা, কোনো মালাই নেই। হাতে নেই খড়্গ। খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাত দিয়ে ডেকে, মুখে বলে– 'আয় আয়, আমার বুকে মুখ লাগায়ে দুধ খা; আমি কালী; মা কালী; ভয় পাস ক্যান? আয়, এই দ্যাখ' বলতে বলতে মা কালী খিলখিল করে হেসে ওঠে; আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে। পা দু'টো ভারি পাথর। নড়তে পারছিলাম না। কথা সরছিল না মুখে। ভয়ে হিম হয়ে আসছিল বুকের রক্ত। আমার কত কাছে দাঁড়িয়ে বিজয়, অথচ মনে হচ্ছিল তেপান্তরের ওপার।

বললাম– 'বিজয়, চেহারাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে!?'

সুমতি

এক

সুমতি তার গায়ের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। সেটা শুধুই আর্তচিৎকার, না মড়াকান্না– তা স্পষ্ট নয়। কাউকে শাপান্ত করছে জন্মের মতো– বোঝা যায়; তবে কাকে এবং কী কারণে, তা বোঝা যাচ্ছে না। আর কী বলছে– তা ক্যাসেটে জড়িয়ে যাওয়া ফিতার মতো কিছু আওয়াজ সৃষ্টি করছে; কিন্তু কোনো বাক্য সৃষ্টি করছে না। যদি তার সেটা কান্না হয়, তবে সে হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাঁদছে কিংবা কাঁদছে আর হাত-পা ছুঁড়ছে। হাত-পাগুলো এমনভাবে ছুঁড়ছে যেন ওগুলো তার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নয়। বা তার মনেই নেই যে ওগুলো তার হাত-পা। হাত-পা গুলো যেন ঘটি-বাটি-থালা-বাসন– ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা যায়; অথচ যেন দড়ি দিয়ে তার দেহের সাথে বাঁধা রয়েছে বলেই ওগুলো ছুটে যাচ্ছে না বা ছুটানো যাচ্ছে না। তবে তার পরনের শাড়ি– ওটা তো আর দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়? তাই নিজ থেকেই ছুটে ছুটে যায়; তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। গায়ে সায়া-ব্লাউজের কোনো বালাই নেই। কোনোকালে তার তা ছিলও না; প্রয়োজনও ছিল না। তাই তাকে কিছুটা অশোভনও লাগছে।

পড়ন্ত বিকেল। নদীর পাড়। নদীর পাড়টা ফেটে ফেটে চৌচির। যেন সুমতির চিৎকারেই ফেটেছে। তিন/চারজন জেলে খেওলা জাল ফেলছে জলে, আবার তুলছে। আবার ফেলছে; আবার তুলছে। তারা যে মাছ ধরছে– এমন মনে হচ্ছে না। কারণ, জাল ফেলছে; জাল তুলছে। মাছ উঠছে কি উঠছে না, তা দেখছে না। কিংবা জাল ঝেড়ে মাছ তুলে খালুইতেও ভরে রাখছে না। জাল টেনে তুলছে, জালের দিকে তাকাচ্ছে; আবার ঝপ্ করে জাল ফেলছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। যেন তারা বোবা এবং কালা। যমরাজের হুকুম পালন করছে। কতগুলো লোক জড়ো হয়ে গেছে নদীর পাড়ে। তারা তামাশা দেখছে। তার মধ্যে মহিলাও রয়েছে দু'চারজন। কেউ কেউ দৃশ্যত মা-কালীর বোন সুমতিকে বেহায়া অবস্থায় দেখে কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়ে নাকসহ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ধরে রেখেছে; চোখ দু'টো অবশ্য খোলা। একটা ন্যাংটা ছেলে বাঁ হাতে নুনু ধরে রগড়াচ্ছে আর ড্যাবড্যাব করে সুমতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছে আর ভাবছে– হাত-পা গুলো ছুঁড়ে জলে ফেলে দিতে চাইছে, অথচ সেগুলো জলে গিয়ে পড়ছে না কেন? এ সময় ভট্ ভট্ শব্দ করে ছোট্ট একটা লঞ্চ যাত্রী বোঝাই করে নদী দিয়ে চলে গেলে সুমতির চিৎকার কিছুক্ষণের জন্য লঞ্চের শব্দের তলে চাপা পড়ে যায়। শোনা গেল না। পাড়ের খুব কাছেই হঠাৎ একটা শুশুক পিঠ জাগিয়েই আবার ডুবে গেল। দু'একটা বাচ্চা সুমতির খুব কাছে গিয়ে চোখের দিকে তাকাল; কিন্তু কোনো জল দেখতে পেল না। তারা হতাশ হয়ে এ-ওর দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বলাবলি করতে লাগল– মনে অয় কান্দে; আরে না; দ্যাহোস না চোহে জল নাই; পাগোল অইয়া গ্যাছে; জিনে পাইছে . . .

গোটা পরিবেশটাই অদ্ভুত, আশ্চর্য। সুমতি সুমতির মতো চ্যাঁচাচ্ছে; কোনোদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। জেলেরা জাল ফেলছে, জাল তুলছে; আবার ফেলছে, আবার তুলছে। সুমতির কান্নাগুলো যেন খালুইয়ে ভরে ভরে রাখছে। কারও সাথে কোনো কথা নেই। যেন ভিন গ্রহের রোবট মানুষ; অন্য জগতের বাসিন্দা। রহস্যময় সব। নদীও সুমতির চিৎকার বয়ে নিয়ে দ্রুত সরে যায় স্রোতে।

দুই

অনেক ঘাটের জল খেয়ে সুমতি শেষে এসে নোঙড় গেড়েছিল বাবুরামের ঘরে। বাবুরাম সাপুড়ে নয়। চাষা। অন্যের জমিতে জন খাটে। দু'চার টাকা যা পায়, কোনোমতে দিনগুজরান করে চলে। বাবুরাম যদিও সুমতির জন্য তৈরি হয় নি; কিন্তু সুমতি অবশ্য বাবুরামের জন্যই তৈরি হয়েছিল। কারণ, সুমতির সুমতি না হলে অত ঘাট বদলে অবশেষে বাবুরামের গলায় বিয়ের মালা পরাত না। বাবুরামের জন্য অন্য কোনো মেয়ে সৃষ্টি হয় নি। একমাত্র সুমতিকেই নির্মাণ করেছেন বিধাতা। কারণ, এর আগে বহু খোঁজা-খুঁজি করেও বাবুরামের জন্য মেয়ে পাওয়া যায় নি; পাওয়া যায় নি মানে, কোনো মেয়ের বাপই তার মেয়েকে বাবুরামের কাছে বিয়ে দিতে রাজি হয় নি। বাবুরাম নামে বাবু হলেও বাস্তবে তার উল্টোটা। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী কেউই তার ঘরটাকে পছন্দ করে নি। তাই বিদ্যা এবং বিত্ত কোনোটাই তার নেই। কিন্তু, তা নিয়ে তার কোনো মাথা-ব্যথা নেই। অবশ্য

বাবুরামের মাথা আছে, কিন্তু মগজ আছে কি না তা নিয়ে গ্রামের লোকদের সংশয় রয়েছে। তাই ব্যথা থাকার প্রশ্নটাও অবান্তর।

সুমতির সাথে বাবুরামের কোনো তফাৎ নেই। বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, সৌন্দর্যে কেউ কারও চেয়ে বেশি যায় না। তফাৎ এই শুধু যে বাবুরাম পুরুষ, সুমতি নারী। আর একটা তফাৎ আছে– বাবুরামের মুখে কোনো দাগ নেই। সুমতির মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্য। মুক্তিযুদ্ধের পরের বছর দেশজুড়ে মহামারি আকারে গুটি-বসন্ত দেখা দেয়। সুমতিও তাতে অংশগ্রহণ করে এবং গুটি-বসন্ত বেশ ভালোভাবেই তার সারা গায়ে-মুখে পদচিহ্ন রেখে যায়। মনে হয় শ্রাবস্তী-খাজুরাহো কিংবা কোনার্কের ভাস্কর্য কালের ছোবলে পরিবর্তিত হয়ে এরকম রূপ ধারণ করেছে এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেয়ে সুমতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুমতির গায়ের রং কালো বললে ভুল হবে। মেটে। ছাইয়া ছাইয়া।

বাবুরাম সুমতির কত নম্বর স্বামী, তাও জানে না সে। ঠিকমতো বলতে পারে না। জিজ্ঞেস করলে আঙুলের কর টিপে টিপে গোনে। গুনে গুনে ভুল করে বলে। কখনও আট, কখনও সাত, কখনও নয়, কখনও ছয়। তবে ছয় থেকে নয় এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নয়-ছয় করে না। এর কম বা বেশি কখনও হয় না। সুমতিরা দুই বোন। ছোটটির নাম মালতী। ভাই নেই। বাবা মারা যাবার সময় ভিটেটুকু ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারে নি। বৃদ্ধা মা সংসার চালাতে অক্ষম। সুমতিকে তাই খালি গা বেলা থেকেই ঝিগিরি করতে হয় বিভিন্ন বাড়িতে। তাই গায়ে জামা ওঠার আগেই হাত উঠেছে এবং হাত পড়েছে– বাবুদের; বাবুদের ছেলেদের। তাই বোঝার বয়স হবার আগেই বুঝে গেছে এবং যৌবন আসার আগেই জেনে গেছে যৌবনের ধর্ম। সুমতি তাই 'না' শব্দটার সাথে পরিচিত নয়। তাই কখনও তাকে 'না' কথাটা বলতে শোনা যায় নি। এ নিয়ে ভোগান্তিও হয়েছে অনেক। গোপনে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে বহুবার। সব ব্যবস্থা অবশ্য বাবুরাই করে দিয়েছে। তার মাথা ঘামাতে হয় নি। কোনো ঝক্কি সামলাতে হয় নি কখনও।

তিন

মাত্র সাতশো টাকায় সুমতি বিক্রি হয়ে যায় এক দালালের কাছে। সবাই অবশ্য জানত সুমতির বিয়ে হয়েছে। পাত্রটির সন্ধান এনেছিল পাশের গ্রামের ঘটক ফটিকচাঁদ। ছেলের বাড়ি বিক্রমপুর; ঢাকার কাছাকাছি। মোটামুটি অবস্থাপন্ন। সে দেশে পাত্রীর বড় অভাব; তাই দূর দেশে এসেছে বিয়ে করতে। কী সুন্দর, আর কী অমায়িক তার ব্যবহার। শিক্ষিতও বটে। মাঝে মাঝে ইংরেজি বলে। 'সুমতির কী ভাগ্য'– তার মা ভাবে। গ্রামবাসীও। কী নম্র, কী ভদ্র! পা ছুঁয়ে সুমতির মাকে প্রণাম করে বলে–

– মা, আপনার মেয়ের কোনো কষ্ট হবে না। আর পরের বাড়ি বেগার খাটতে হবে না। আশীর্বাদ করবেন– আমরা যেন সুখে থাকতে পারি। সুখে থাকতে বিয়ের পরের দিনই সুমতি তার স্বামীর সাথে চলে যায় বিক্রমপুরে। পথ মোটে ফুরোয় না। দিন যায়, রাত যায়; দিন আসে। বিক্রমপুর আসে না। সুমতি জানে– বিক্রমপুর বহুদূর। কিন্তু জানে না, বিক্রমপুর; কত কত দূর!

বাস থেকে নেমে আবার বাস। সেই বাস পাল্টে অন্য বাস। রিক্সা। ট্রেন। রিক্সা। ট্যাক্সি। রিক্সা। বিশাল এক শহর। গিজ্ গিজ্ মানুষ। গায়ে গায়ে ঘষা লাগে। বড় বড় দালান। এরা কথাও বলে যেন তাদের মতো নয়। অন্য রকম। সুমতি বোঝে না। লিখতে-পড়তে পারে না বলে কোন জায়গায় এসেছে, তাও বুঝতে পারে না। স্বামী বলে–

- এই হলো বিক্রমপুর।

নিয়ে যে বাড়িতে ওঠে, তার স্বামী বলে– সেটা তাদের বাড়ি। সুমতি অবাক হয়– কত বড় দালানের মালিক তার স্বামী! তার স্বামী নাকি চাকরি করে। সকালে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। সেদিন সন্ধ্যায় টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। স্বামী বাড়ি ফিরে–

– তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ন্যাও। এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন। সুমতি তৈরি হয়। রিক্সায় চড়ে বেড়াতে যায়। এখানের রিক্সা যেন কেমন। ঠিক রিক্সার মতো নয়। বড় বড় চাকা। মানুষে টানে। হাতে ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং। ওই ঢং ঢং শব্দ শুনলে সুমতির বুকের ভেতরটা যেন কী রকম কেঁপে কেঁপে ওঠে।

একটা বাড়ির সামনে এসে রিক্সাটা থামে। বিরাট গোঁফওয়ালা দারোয়ান দরোজা খুলে দেয়। স্বামীর পেছন পেছন যন্ত্রচালিতের মতো সুমতি ঢোকে। তার গা কেমন ছম্ ছম্ করতে থাকে। একটা ঘরের সামনের পর্দা একটু ফাঁক করতেই ভেতর থেকে গমগমে এক কণ্ঠ বেজে ওঠে–

– আইয়ে, আইয়ে। ইয়ে তো বহত আচ্ছা লাড়কি হ্যায়। ব্যয়ঠে।

সুমতি ভাবে– কোন ধরনের কথা বলে এরা? তাদের মতো নয়। সুমতি বসে। কেমন নরম। পাছা ডুবে যায়। প্রায় পড়ে গেছিল। তার স্বামী লোকটার কাছে গিয়ে বসে। লোকটা যেন বাচ্চা হাতি। বিশাল পেট। মনে হয় পেটের মধ্যে তিন/চারটে বাচ্চা রয়েছে। লোকটা পাতিশিয়ালের মতো কেমন খ্যাক খ্যাক করে হাসে। একটা কথাও সুমতি বুঝতে পারে না। বোতল থেকে কী একটা গেলাসে ঢালে। আর একটু একটু চুমুক দেয়। মনে হয় জল খায়। কিন্তু জল কি কেউ ওরকম একটু একটু খায়? লোকটার চোখদু'টো জবাফুল। কথা বলে, মনে হয় জিভে পাথর বাঁধা। জড়িয়ে থাকে।

কানে কানে কী কথা হয়, সুমতি বোঝে না। তারপর দু'জন উঠে চলে যায় পাশের ঘরে। ফিরে আসে একটু পরে। সুমতিকে তার স্বামী বলে–

– তুমি বসো। বাইরে একটু কাজ আছে। আমি কাজটা সেরেই চলে আসবো। আমার বন্ধু, তোমার কোনো ভয় নাই। চলে যায়। সময় মোটে সরে না। কিংবা সরে যায়, টের পায় না। স্বামী আসে না। রাত বাড়ে। শহরের রাত বোঝা যায় না। স্বামী ফেরে না। দুশ্চিন্তা বাড়ে। হাতির মতো লোকটা টলতে টলতে কাছে এগিয়ে আসে। নিচে নরম গদির সোফা, উপরে নরম গদির মতো লোকটা; সুমতি তলিয়ে যায়। এর পরের অধ্যায় সুমতির জানা; তার আগের চেনা। রাত শেষ হয় কি হয় না, সুমতির স্বামী আর ফেরে না। সুমতি বিশাল ভুড়ির নিচে চাপা পড়ে থেকে যায়।

সুমতির কষ্ট হয়, কিন্তু তত খারাপ লাগে না। এ অন্ধকার জগতের সঙ্গে তার পরিচয় বহু দিন ধরে। পার্থক্য এটুকুই– আগে বাসন-কোসন মাজতে হতো; এখন গা টিপতে হয়। আগে ভালো জায়গায় থাকতে দিত না; এখন ভালো জায়গায় থাকে। আগে গ্রামে ছিল; এখন শহরে। আগে ডাল-ভাত; এখন পোলাও-বিরিয়ানি। সমস্যা একটাই– ওই আড়াই-মণি লোকটাকে তার ভয় লাগে। পাহাড়ের মতো চেপে বসে তার গায়ে। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আর একটা সমস্যা– তাকে ঘরের বাইরে কখনও বেরুতে দেয় না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

দিন যত যায়, সুমতি তত অস্থির হয়ে ওঠে বেরুবার জন্য। দিনের পর দিন চারদিকে শুধু দেয়াল আর দেয়াল। ভাল্লাগে না, সুযোগ খুঁজতে থাকে। লোকটা তো সারাদিন বাড়ি থাকে না। অন্য কোনো লোকও নাই বাড়িতে। দারোয়ানটা শুধু থাকে। তাও খৈনি খেয়ে সারাদিন ঢুলতে থাকে। বসে বসে দারোয়ানটা নাক ডাকছে। সুযোগ বুঝে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে সুমতি। কিন্তু যাবে কোথায়? সে চেনে না কিছুই। এ শহরই চেনে না সুমতি। সামনে যে গলি পায়, সে গলিতেই হাঁটে। পথে একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে–

– ও বাবু ,এডা কোন্ জায়গা?

– শ্যাম বাজার।

– এডা কি বিক্রমপুর না?

– বলে কী? বিক্রমপুর কোন জায়গা? এটা কলিকাতা শহর।

– এইডা কলিকাতা? নাম হুনছি।

– তুমি কোথা থেকে এসছ?

– আমগ্রাম।

– আমগ্রাম? সে আবার কোথায়?

– নাম হোনো নাই? ফরিদপুর, ফরিদপুর।

– তা এখানে এলে কী ভাবে?

সুমতি বলে যায় সব। বাবুটি খুব হৃদয়বান। সুমতিকে বলে–

– তুমি আমার সাথে এসো।

সুমতি যেন এক টুকরো মেঘ, যার কোনো দেশ নেই; নিবাস নেই। অনুকূল বাতাস পেলেই ভেসে চলে। নিরুদ্বেগে নিরুদ্দেশ করে যাত্রা। বাবুটি যেখানে নিয়ে যায়, সেখানে এরকম বহু নারী-পুরুষ ঘোরাফেরা করে। চুপিচুপি কথা বলে; অবশেষে একজন পুরুষের সাথে আসা মেয়েটা অন্য পুরুষের সাথে চলে যায়। সুমতির অবশ্য কিছুতেই কিছু আসে যায় না। সে দেখে আর কথা শোনে। কথা শুনে শুনে সে বুঝে নেয়– জায়গাটার নাম বউবাজার এবং এখানে মেয়ে বিক্রি করা হয়। সে বুঝতে পারে, বাবুটি তাকে বিক্রির জন্য এখানে নিয়ে এসেছে। সে এবারে এও বুঝতে পেরেছে, যে তাকে বিয়ে করেছিল; আসলে সেও তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল ওই হাতির মতো মাড়োয়ারি লোকটার কাছে। সুমতি ভাবে– সবখানেই কি এক কাণ্ড! সবাই কি শুধু এ ব্যবসাই করে? শুধু ভাবে; কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এতে তার কিছু যায় আসে না। অবশেষে সেও আর একবার বিক্রি হয়ে যায়। সুমতি যাকে 'বিয়ে' ভেবেছিল; এখন বুঝতে পারে, আসলে তাও ছিল বিক্রি হওয়া। তারও আগে বাবুরা, বাবুদের ছেলেরা গোপনে টাকা দিত; স্নো-পাউডার কিনে দিত। সুমতি বোঝে– আসলে তাও ছিল বিক্রি হওয়া। সুমতি ভাবে– বারবার বিক্রি হবার জন্যই কি তার জন্ম হয়েছিল?

বেশ কিছুদিন বাদে সেখান থেকেও সুমতি পালায়। সোনাগাছি বলে একটা জায়গায় এসে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে। তার কোনো ব্যাগ নেই; পোশাক নেই; টাকা নেই; পয়সা নেই। পথের ভিখারি। সেখানে পৌঁছে দেখে– সুন্দর সুন্দর মেয়েরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে, সেজে গুজে জোড়ায় জোড়ায় ঢলাঢলি করছে। কেউ কেউ কেমন কেমন করে পুরুষদের দিকে তাকায়, ইশারা করে। ব্যাপারটা কী, জানতে ইচ্ছে জাগে। তাছাড়া খুব ক্ষিধেও পেয়েছে। আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে পড়ে। মোটা মতো এক বয়স্ক মহিলাকে দেখে, তার কাছে গিয়ে বলে–

– ও দিদি, এইডা তোমাগো বাড়ি? হ্যারা কী করে?

– তুমি কোথা থেকে এসেছো?

– আমগ্রাম। ফরিদপুর। যা ক্ষিদা লাগছে। কয়ডা খাওন দেবা? মহিলার কী মনে হলো, একটু চিন্তা করে–

– চলো, ভেতরে চলো। খাবার দেবো।

এখানেও সুমতি আটকা পড়ে গেল। সুমতিও এখন রঙ মেখে, ঢঙ্ করে ইশারায় পুরুষ ডাকে। হাসতে ইচ্ছে করে না; তবুও হাসে। ছেলেবেলায় তাদের গ্রামে দেখা যাত্রার নায়িকাদের মতো কথা বলে। সুমতি খদ্দের ধরে; খদ্দের ছাড়ে; কেবল সে নিজেই বন্দি মাকড়সার জালে। নিজেকে নিজে ছাড়াতে পারে না। সুমতির কষ্ট হয় কি হয় না; তা সে বোঝে না। শুধু বোঝে– এর চেয়ে তার গ্রামই ভালো ছিল। কিন্তু কী করে ফিরবে সে তার প্রিয় আমগ্রামে? সে পথ চেনে না; ঘাট চেনে না। টাকা-পয়সা নেই। তাছাড়া সে এটুকু বুঝে গেছে যে, সে এখানে বন্দি। বেরুনোর কোনো রাস্তা খোলা নেই। এখানে পুরুষেরা আসে– বেরিয়ে যায়। মেয়েরা আসে, আর বেরুতে পারে না। ছেলেবেলায় বাঘ ঘুঁটি খেলেছে অনেক। সে যেন ছেলেবেলার সেই ঘুঁটির মতো বাঘবন্দি। বেরুনোর আশা তাই জাঁতাকলের ইঁদুর।

তবু পালাতে তো তাকে হবেই। পালিয়ে বেড়ানোই যে তার জীবন। কিন্তু যেখানেই পালায়; যৌবন যায় তার সাথে। তাই আবার পালাতে হয়। সে যেন রশিছেঁড়া ডিঙা, ভাসে। ভাসতে ভাসতে এ ঘাট, ওঘাট ঠোকর খায়; আবার ভাসে। বাঁধা পড়ে না কোনো ঘাটে। সুমতি তাই জানে না– কে তার স্বামী; আর কে তার খদ্দের? কার কাছে, ক'বার বিক্রি হয়; বিক্রির টাকা কে পায়? কোনটা বিয়ে, আর কোনটা বেচাকেনা; সে পার্থক্য খুঁজে পায় না।

সে আবার পালায়। ইতোমধ্যে কেটে গেছে বহুকাল। কতকাল– তা সে জানে না। কারণ, এ অন্ধকার পল্লীতে কখনও সূর্য ওঠে না। দিন-ক্ষণ বন্দি হয়ে যায় অন্ধকার ঘেরাটোপে। চির জ্যোৎস্নার জৌলুস এখানে। তাই কোনো হিসেব নেই দিন কিংবা রাত্রির। হতে পারে কয়েক মাস কিংবা বছর। কিংবা যুগ যুগ। আদি-অন্তহীন অন্ধকার। অন্ধকার চিরে একদিন সে বেরিয়ে আসে পথে। রাস্তায় পুলিশ দেখে। সে পুলিশ চেনে। তাদের কাছে সব খুলে বলে। বলে, তার বাড়ি ফরিদপুর। আমগ্রাম। সে বাড়ি যেতে চায়। পুলিশরা তাকে গাড়িতে করে থানায় নিয়ে যায়। সেখানেও পুলিশরা তার স্বামী হয়। রাতে লোডশেডিং হলে এক পুলিশ কাছে এসে তার গায়ে হাত দেয়। প্রথমে সে ভয় পেয়ে আঁৎকে ওঠে। পুলিশ বলে–

– তোর কী হয়েছে?

– জ্বর অইছে।
– কোথায়, তোর গা তো গরম না?
– আমার অন্তরজ্বরা অইছে।
এ শব্দটা শুনেছিল সোনাগাছির এক বাবুর কাছে। সুমতির ঘরে এলে, প্রথম দিনেই, সুমতি একটু কেঁপে উঠেছিল। বাবুটি বলে উঠেছিল–
– কী রে, তোর কি জ্বর হয়েছে?
সুমতি বলেছিল– 'না'
– তাহলে কি অন্তরজ্বরা হয়েছে?
সেই থেকে সুমতি কথাটা শিখে রেখেছে। সুযোগ বুঝে আজ প্রয়োগ করে দিল। আর পুলিশও তাকে প্রস্তাব দিল–
– তুই আমার বউ হবি? আমি তোকে বিয়ে করবো।
সুমতি জানে– 'বউ' হবার মানে কী? 'বিয়ে' কথাটার অর্থ কী? তাই রাজি হয়ে যায়। বলে–
– তাইলে আমারে বাড়ি পাঠায়ে দেবানে?
– হ্যাঁ, কাল সকালেই ব্যবস্থা করবো।
এরপর লোডশেডিং এর ভেতর সুমতি কিছুক্ষণের জন্য পুলিশের বউ হয়। পুলিশের বউ হলেও 'কাল'ই তাকে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হয় না। আরও কিছুদিন তাকে হাজতে আটকা থাকতে হয় এবং আরও কিছু পুলিশের বউ হতে হয়। তারপর তার বাড়িতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং কয়েক বছর বাদে সুমতি বিক্রমপুর থেকে নাইওরে আসে আমগ্রামে তার বাবার বাড়ি। গ্রামে এর বেশি কেউ কিচ্ছু জানে না। সুমতি রটায়– তার স্বামী কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে; আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি তার। স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে সে বাবার বাড়ি ফিরে এসেছে।

চার

কালীগঞ্জ বাজারের পুবদিকে বাবুর খাল। এটা নামেই খাল। আসলে নদী। ছোট নদী। বর্ষায় এখানে নৌকা বাইচ হয়। নদীটা চওড়া কম হলেও গভীর কম নয়। স্রোতও থাকে বেশ। শুশুক আছে প্রচুর। কখনও কখনও দু'একটা কুমির ঢুকে পড়ে এ নদীতে। দু'চার বার দেখাও গেছে। তবে গরু-বাছুর কিংবা কোনো মানুষের বাচ্চা টেনে নিয়েছে, এমন শোনা যায় নি। প্রচুর মাছ এ নদীতে। জেলেরা প্রায়ই মাছ ধরে।
নদীর পুব পাড়ে কলাবাড়ি। সুমতি ফিরে আসার কয়েকমাস পরে কলাবাড়ির বাবুরামের সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়। প্রথম প্রথম সুমতি অবশ্য এ বিয়েকে আলাদা কিছু মনে করে নি। সময় যেতে যেতে সুমতি এক সময় বুঝতে পারে– এটা আসল বিয়ে। তার এবারের স্বামীটির নাম বাবুরাম হলেও আসলে সে 'বাবু' নয়। যদিও গায়ের জড়ুলের মতো অভাব লেগে আছে সবসময়ই। তবুও কোথায় যেন একটু সুখ আছে। বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা টুনটুনি পাখি যেন বাসা বেঁধেছে। থেকে থেকে টুনটুন করে। সুমতির প্রাণ ভরে যায় সুখে।
বাড়ির পাশেই দশোহরার আড়ং। নৌকা বাইচ। মেলা বসেছে। বাবুরাম দুপুরের পরপরই সুমতিকে নিয়ে আড়ঙে যায়। চুড়ি, চুলের ফিতা, আলতা আরও অনেক কিছু সুমতিকে কিনে দেয় বাবুরাম। দু'টাকা দামের একটা খিলিপান কিনে দিয়েছিল। বাবুরামও একটা খেয়েছিল। কী মিষ্টি-ঝাল! আর কী ঘ্রাণ! সুমতির মনে হয়– তার চেয়ে কেউ সুখী নেই। খিলিপানের ঘ্রাণটা যেন তার নিজেরই প্রাণের ঘ্রাণ।
সকালে বিকেলে মাঝে মাঝে জাল নিয়ে নদীতে যায় বাবুরাম। দু'চার খেও দিলেই খাবার মাছ উঠে আসে। সুমতির গর্ভবতী অবস্থায় কোনো কোনো দিন বাবুরাম নিজেই মাছ কেটে রান্না করে। সুমতিকে হাত লাগাতে দেয় না। একদিন পুঁটিমাছের ঝোল রেঁধেছিল পেঁয়াজ দিয়ে। কী যে মজা হয়েছিল! সুমতি খেতে খেতে বলেছিল–
– কী সোন্দর ঝোল রানছো! মোনে অয় অম্রিতি।
বাবুরাম বলেছিল–
– এই রান্নাডা আমার মায়ের থোন হিকছিলাম। আর এট্টা মাছ ন্যাও। আর এট্টু ঝোল দেই?

সুমতি 'না' করে না। তৃপ্তি ভরে খায়।

শীতের সকাল। ভোর থেকেই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সুমতি। অবশেষে সুমতির একটা মেয়ে হয়। প্রথম সন্তান হলেও উৎসবের কোনো আড়ম্বর নেই। রোজকার মতো বাবুরাম কাজে যায়। জন্ম-মৃত্যু কোনোটারই তেমন কোনো গুরুত্ব নেই তাদের কাছে। এ যেন আষাঢ়ের মেঘ, আসার সময় হয়েছে; আসছে। যাবার সময় হবে; চলে যাবে।

কী ভেবে বাবুরাম মেয়ের নাম রেখেছে ময়না, তা কেউ জানে না। জন্মের পর থেকেই অবশ্য সে ভুগছে। সর্দি, কাশি, জ্বর, হাম, খুজলি, পাঁচড়া লেগেই আছে। ময়না যেন রোগের ডিপো। আর সারাদিন বেসুরো সানাইয়ের মতো বেজেই চলে। তার চিৎকারে পাড়া অস্থির। ডাক্তার-বদ্যিতেও কোনো কাজ হয় না। কালীগঞ্জ বাজারের হরেন ডাক্তার একটা চামার। গেলেই বলে–

– আগে দুই টাকা দ্যাও।

টাকা না দিলে কোনো কথাই বলে না। ওষুধ বলতে মিক্সচার আর সিরাপ। তার দাম অবশ্য আলাদা। সুমতির অত টাকা নেই। তাই ওষুধও দেয় তেমনি তেলে-জলে। আর ময়নাও চ্যাঁচায় গলা ফাটিয়ে। রোগ তার ভালো হয় না। কিংবা এটা সারে তো অন্যটা ধরে। রোগ ময়নার বারোমাইস্যা। সুমতির সহ্য হয় না। দু'এক ঘা লাগিয়ে দেয় ময়নাকে মাঝে মধ্যে– কান্দোস ক্যান বান্দোসুগি; যোমেও নেয় না তোরে; হারাডা দিন প্যানোর প্যানোর; কার সইজ্‌জো অয়?

বাবুরামকে ডেকে বলে–

– এই ন্যাও তোমার মাইয়া; মাইয়াতো না য্যানো ফাডা বাঁশি। আমি আর পারি না। হ্যার জইন্যে মরারও সময় পাই না।

বাবুরাম কোলে নেয়। কান্না থামে না। দ্বিগুণ হয়। চুলকানি আর পাঁচড়ায় সারা গা ভর্তি। মাথায় পাঁচড়া পেকে পুঁজে-চুলে জড়াজড়ি। আঙুলে-নখে সারাক্ষণ খামচাতে থাকে। কোথাও কোথাও রক্ত-পুঁজে একাকার। পুরো মাথাটাই যেন কাঁঠালের ভুতি– মাছি ভন্ ভন্ সারাক্ষণ। দুর্বিষহ অবস্থা। সুমতি ছুটে যায় বাজারে। ডাক্তারের কাছে। গালাগাল ছুঁড়ে দেয়– ও ডাক্তার, তুমি কী অসৈত দ্যাও; মাইয়াডার তো কোনো উন্নেতি অইতেছে না। প্যান্দের ডাক্তার অইছো?

– টাকা দিবি না, আবার মাইয়া ভালো করতে চাস্? হেডা ক্যামোন কতা?

সুমতি দু'চার আনা পয়সা দেয়। ডাক্তার সে অনুসারে ওষুধ দেয়। রোগীর রোগের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুমতির অশান্তি বেড়েই চলে। মাঝে মাঝে ময়নাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে জাগে। কখনও মনে হয় কলপাড়ের শানে আছাড় মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। কিন্তু পারে না। পারে না বলেই ময়না এখনও মরে নি; বেঁচে আছে। আর ময়না বেঁচে থেকে সুমতিকেই বাঁচতে দিচ্ছে না।

বর্ষা শেষ। বিকেল বেলা। সুমতি ময়নাকে নিয়ে চলছে কালীগঞ্জ বাজার। ডাক্তারের উদ্দেশে। বাবুরখালের পাড় এসে দাঁড়িয়েছে খেয়া নৌকার আশায়। লোক বোঝাই হলে ওপার থেকে ছাড়বে। ময়না আজ বেশি বিরক্ত করছে। সুমতির সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে হয়, নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দু'টো ধমক দেয়– এ্যাই, এট্টুও কানবি না। ধইর‍্যা জলে ফেলাইয়া দেবো।

ময়না আরও দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।

– চুপ্, চুপ্ বলে ঠাস্ ঠাস্ কায়েকটা থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় সুমতি। পাঁচড়া ফেটে পুঁজ ও রক্ত লাগে সুমতির হাতে। ময়না আরও জোরে চ্যাঁচাতে থাকে। সুমতির আর সহ্য হয় না–

– থাম্, থাম্ ঢেমনি; নইলে ধইর‍্যা ফ্যালাইয়া দেবো গাঙ্গে। ময়না থামে না। সুমতির কথা বোঝে না দশ মাসের ময়না। সে যন্ত্রণা বোঝে; কষ্ট বোঝে; কথা বোঝে না। তাই সে কাঁদে। আকাশ ফাটিয়ে চ্যাঁচায়। অনর্গল চ্যাঁচাতে থাকে। সুমতির মথায় রক্ত উঠে যায়।

– চ্যাঁচা হারামজাদি; যতো পারোস্ চ্যাঁচা–

বলে এক ঝটকায় সুমতি ময়নাকে ছুঁড়ে মারে নদীতে। ঝপ্ করে একটা শব্দ হয়; কিছুটা জল ছলকে ওঠে উপরের দিকে। ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যায় ময়না। নদী আগের মতো চলে।

ময়নার চ্যাঁচানো বন্ধ হয়। নিরবচ্ছিন্ন চ্যাঁচানো বন্ধ হলে সুমতি সংবিৎ ফিরে পায়– কিছু একটার অভাব পড়েছে। ময়না চ্যাঁচায় না। চেতনা ফিরে আসে। তারপর হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে চ্যাঁচাতে শুরু করে। ময়না তার চ্যাঁচানোকে সুমতির কাছে গচ্ছিত রেখে মিলিয়ে যায় স্রোতে।

এরপর ময়নার খোঁজে জেলেরা জাল ফেলে, জাল তোলে। জাল ফেলে, জাল তোলে। মাছ নয়, সুমতির কান্নাকেই খালুই ভরে রাখে। সূর্য ডুবে গেলে নদীর পাড় অদৃশ্য হয়। জাল ফেলার শব্দ ওঠে– ঝপ্ ঝপ্। জাল তোলার শব্দ শোনা যায় না। আর সুমতির কণ্ঠে শুধু শোনা যায় ময়নার অসমাপ্ত চিৎকার।